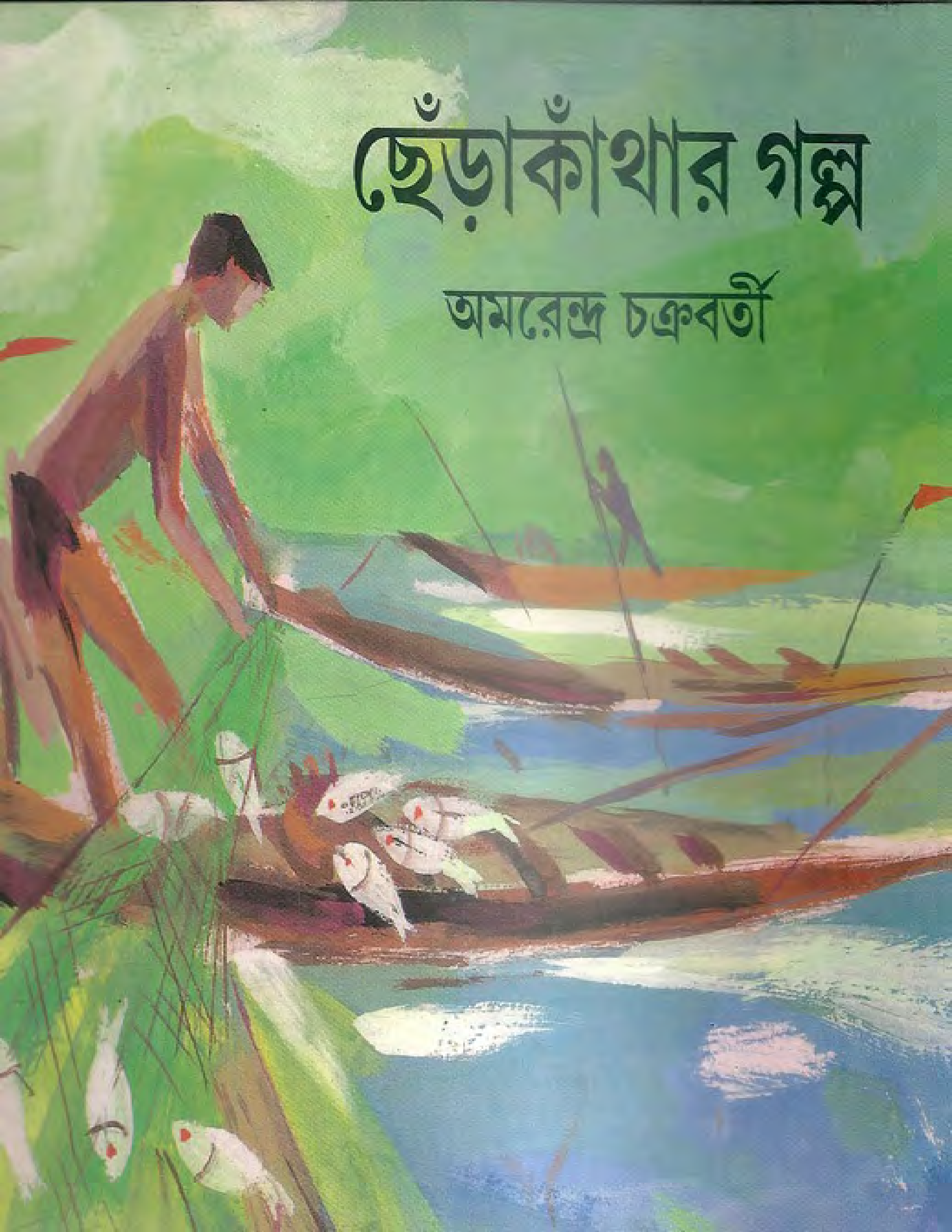
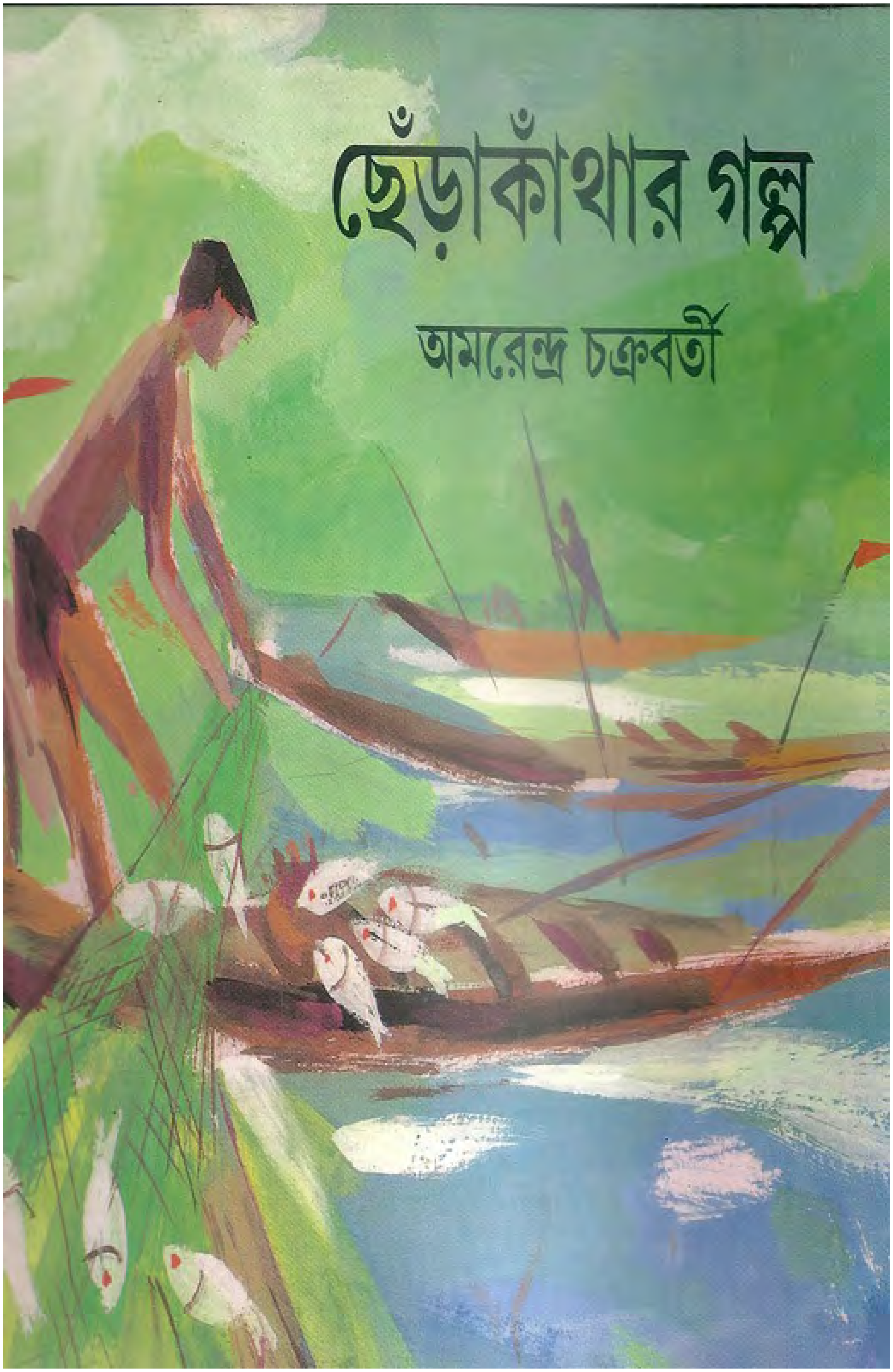
ছেঁড়াকাঁথার গল্প

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী





ছেঁড়াকাঁথার গল্প
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

ছেঁড়াকাঁথার গল্প

.ছঁড়াকাঁথার গল্প

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড

CHHERAKANTHAR GALPO

A collection of short stories for children by Amarendra Chakravorty

প্রথম প্রকাশ

জানুয়ারি ২০০৬ (১০০০ কপি)

ি. তীয় মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২ (১১০০ কপি)

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

ISBN 81-86891-58-7

প্রকাশক সর্বাণী চক্রবর্তী

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড

২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯

ই-মেল books@swarnakshar.in

ওয়েবসাইট : www.swarnakshar.in á www.amarendrachakravorty.com

মুদ্রক নবপ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

৬৬, গ্রে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৬

হরফ বিন্যাস স্বর্ণাক্ষর

.ছাটদের জন্য শেষ ছোটগল্প লিখেছিলাম ‘আমাজনের জঙ্গলে’ উপন্যাসটির এক বছর আগে, ১৯৯৯-এ । তারপর গত চার-পাঁচ মাসে লেখা পাঁচটি গল্প নিয়ে এই বই । প্রথম তিনটি গল্প নতুন ‘সন্দেশ’-এর নতুন দুই সম্পাদকের নিমন্ত্রণে লিখতে হয়েছে । বিশেষ করে, শ্রী সুজয় সোমের লাগাতার তাগাদা ছাড়া এমন ঘন ঘন গল্প লেখা আমার হতই না । চতুর্থ গল্পটি শ্রী দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাপে তাঁর ‘পাতাহরপ’ পত্রিকার জন্য লেখা । শেষ গল্পটি ‘শারদীয় গণশক্তি’র ছোটদের পাতার দাবিতে ।

তবে যাদের জন্য লেখা, তাদের এ বই ভালো লাগলে তবেই লেখার সার্থকতা ।

কলকাতা

১৮-১-২০০৬

আহ্লাদীর বন্ধু ঋষিকে

কোন পাতায় কোন গল্প



ছেঁড়াকাঁথার গল্প



আলাস্কার সোনা



দুঃখী মাছ



আহ্লাদী কবে কথা বলবে



বুলবুলির বাসা



ছেঁড়াকাঁথার গল্প

পাশাপাশি দুই দেশ। একই নদী দু দেশের মধ্যে দিয়ে

বয়ে চলেছে। ডাঙায় যেরকম কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে এক দেশ থেকে আরেক দেশকে আলাদা করা হয়, নদীর ওপর তো সেরকম বেড়া দেওয়া যায় না। জলের ওপর দাগ কাটাও অসম্ভব।

ফলে কী হয়, এক দেশের জেলেরা মাছ ধরতে গিয়ে মাঝেমাঝেই নৌকো নিয়ে অন্য দেশে ঢুকে পড়ে। নদীর মধ্যে ঠিক কোথায় এই দেশের শেষ আর ওই দেশের শুরু তা কে তাদের বলে দেবে!

এবছর বর্ষাকালে যুধিষ্ঠির তার দুই ছেলেকে নিয়ে ইলিশমাছ ধরতে বেরিয়ে কখন যে নদী বেয়ে নিজের দেশ পেরিয়ে অন্য দেশে ঢুকে পড়েছে বুঝতে পারেনি।

সারারাত জালে প্রচুর ইলিশ উঠতে দেখে ভোরের দিকে যুধিষ্ঠির ছেলেদের বলল,"আজ আমাদের ভাগ্যটা কী ভালো দেখেছিস! যেখানেই জাল ফেলছি, ঝাঁক ঝাঁক ইলিশ! মাছ তো নয়, যেন বস্তা-বস্তা রুপোর টাকা উঠছে!"

ভাগ্যে ঠিক কী আছে যুধিষ্ঠির তা টের পেল চারদিকে সকালের আলো পুরোপুরি ছড়িয়ে পড়ার পর।

তার নৌকোর সামনেই ভিনদেশী জলপুলিশের নৌকো! নৌকোটা আরও কাছে এলে একজন জলপুলিশ লাফিয়ে তার নৌকোয় উঠে পড়ল। তারপর নৌকোটাকে তীরের দিকে নিয়ে চলল।

যুধিষ্ঠির আর তার দুই নাবালক ছেলেকে সারারাত হাজতে রেখে পরদিন সকালে মাছ চুরির দায়ে তাদের আদালতে নিয়ে গেলে সে-দেশের বিচারকমশাই যুধিষ্ঠিরকে এক বছরের জেল, আর ছেলেদুটির বয়স কম বলে তাদের তিন মাসের জেল খাটবার হুকুম দিলেন।

আর সেই ইলিশগুলো? যেহেতু চুরি করে ধরা, তাই তাদের আবার নদীতে ছেড়ে দেওয়ার আদেশ হল ।



ইলিশমাছ একবার ডাঙায় উঠলে আর বাঁচে না— সেকথা না বিচারক, না পুলিশ, কারও মনে পড়ল না ।

যুধিষ্ঠির তার ছেলেদুটোকে বড্ড ভালোবাসে । তারা যখন বিদ্যাধরী নদীর তীরে হেতাল-গরাণের হালকা ছায়ায়, তকতকে নিকোনো উঠোনে হামাগুড়ি দিত, তখনই তাদের মা এককোমর জলে চিংড়ির ‘মীন’ ধরতে গিয়ে নদীতে তলিয়ে যায় । কুমির তার হাঁটু কামড়ে ধরে গভীর জলে টেনে নিয়ে গিয়েছিল । সেই কুমিরটাকে পরে আবার দেখা গেছে — নদীতীরে শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে, কিন্তু তাদের মাকে আর কোনওদিন কোত্থাও দেখতে পায়নি দুই ভাই ।

ভিনদেশের জেলখানায় একদিকে যুধিষ্ঠির আর অন্য দিকে তার ছেলেদুটিকে রাখার ব্যবস্থা হল ।

দুই ভাই প্রথম প্রথম ভয়ে চিৎকার করে কাঁদত, তারপর দুঃখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত, তারপর চুপ করে কখনও বসে থাকত আর ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ত ।

ক্রমশ তাদের দুঃখ, ভয়, ক্লান্তি বেশ খানিকটা সয়ে গেল ।

দুভাই তিন বছর তাদের গ্রাম থেকে তিন গ্রাম দূরের স্কুলে পড়তে গিয়ে কয়েকটা ছড়া মুখস্থ শিখেছিল, এখন জেলে বসে একজন আরেকজনকে দুলে দুলে ওইসব ছড়া শোনায় । সেইসব ছড়া বাঘ, কুমির, মাছ, মধু, নৌকো, নদী— এইসব নিয়ে গ্রামের কবিরাই বানিয়েছে ।



জেলখানায় তিন মাস শেষ হতেই দুই ভাইকে জেলের বাইরে এনে দুজন পুলিশ একটা রিকশায় তাদের তুলে দিয়ে রিকশাওলাকে বলল, “সোজা নদীতীরে পা-ধোওন পানিঘাটে নিয়ে যা । শিরীষগাছের গুঁড়িতে ওদের নৌকোটা বাঁধা আছে । নৌকোর পিঠে

আলকাতরায় ১১১ নম্বর লেখা । নৌকোয় উঠল কিনা স্বচক্ষে দেখে এসে আমাকে থানায় রিপোর্ট করবি ।”

শুনে দুভাই একসঙ্গে কেঁদে ফেলে বলল, “আমাদের বাবা কোথায়?”

দুজন পুলিশের একজন পানের ডিবে থেকে একটা পান নিয়ে মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে বলল, “তিনি আর নাই গো । তোমাগো দুঃখে তিনি চোখের জল ফ্যালতে ফ্যালতে প্রাণত্যাগ করসেন ।”

শোকে-দুঃখে মুখে তার ছেলেবেলার গ্রামের ভাষা এসে গেছে । চোখদুটোও জলে ভেজা । পানের পিক ফেলে রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে হল ।



নৌকো চলেছে তো চলেইছে । বড়ভাই বসেছে হালে, ছোটভাই ধরেছে দাঁড় । বড়ভাই শক্ত মুঠোয় কব্জি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাল নাড়াচ্ছে, ছোটভাই জোরে জোরে দুহাতে দুই দাঁড় বাইছে । প্রথম থেকেই মাথার ওপর একটা চিল যেন তাদের সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চলেছে । চিল সাধারণত যেরকম উঁচুতে ভেসে বেড়ায়, এটা তেমন নয় । বেশ অনেকটা নীচে, দুভাইয়ের প্রায় মাথার ওপর, নৌকোর ঠিক সামনে উড়ে চলেছে ।

বড়ভাই রোদে চোখ কুঁচকে চিলটাকে দেখতে দেখতে হঠাৎই বলে উঠল, "কেতু, এ আমাদের বাবা নয় তো! হয়তো চিলের বেশে বাবাই আমাদের সঙ্গে দেশে ফিরছে! না হলে মাছ ছোঁ মারার সময় বাদে চিল কখনও এত নীচে নামে?"

ছোটভাই কেতু জোরে জোরে দাঁড় বাইতে বাইতে বলল, "দাদা, দুঃখে তোর মাথার ঠিক নেই । মানুষ কখনও চিল হতে পারে?"

"মানুষের আত্মা পাখির মতো আকাশে উড়তে পারে না? বাবার আত্মা চিলের বেশে আমাদের কাছে কাছে থাকতে চাইছে রে!"

নৌকো কোনদিকে চলেছে কে জানে । বিদেশ শেষ হয়ে এতক্ষণে কি তারা দেশের নদীতে পড়েছে? নাকি এখনও বিদেশের নদীতেই আছে? এদিকটায়, এত দূরে তারা বাবার সঙ্গেও কোনওদিন আসেনি । এই নদী তাদের সম্পূর্ণ অচেনা ।



দিন শেষ হয়ে আসছে । খিদেয় দুভাইয়ের গা গোলাচ্ছে । ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছে । শক্ত মুঠোয় হাল ধরে থাকা বা গায়ের জোরে দাঁড় বাওয়া আর বুঝি পারে না । কাছে-দূরে আর কোনও নৌকো বা ভুটভুটি বা লঞ্চও চোখে পড়ছে না । তবে কি আর কোনও নতুন দেশে তারা ঢুকে পড়েছে! নদীও ক্রমশ আরও চওড়া, হয়তো আরেকটু পরেই সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে ।

এই অবস্থায় হঠাৎ নদীর ওপর সন্ধ্যা নামল। যেন ছুড়ে দেওয়া হাতজালের মতোই জলের ওপর ছড়িয়ে পড়ল।

চিলটাকেও আর আকাশের কোথাও দেখা গেল না।

সেই পাতলা অন্ধকারে তাদের চোখে পড়ল, একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে দোতলা একটা জাহাজ। জাহাজের পাশ থেকে একটা ছিপনৌকো তীরের বেগে এসে তাদের নৌকোর গা ঘেঁসে দাঁড়াল। সেই নৌকো থেকে একটা লোক মস্ত একটা ভারি নোঙর দুহাতে তুলে ছুড়ে দিল কেতুদের নৌকোয়। আরেকটু হলেই সেই ঝাঁকুনিতে তাদের নৌকো উলটে যেত।

ছিপনৌকো যেমন এসেছিল তেমনই ফিরে চলল জাহাজটার দিকে, টেনে নিয়ে চলল দুভাইয়ের নৌকোটাকেও। তারপর দড়ির সিঁড়ি দিয়ে দুভাইকে জোর করে তোলা হল জাহাজে।



জাহাজে প্রায় কুড়ি-পঁচিশজন লোক । রঙিন প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে একটা লোক রিভলবারে গুলি ভরছিল, কেতুদের একবার দেখে নিয়েই বলল, ‘‘এদিকে কোথায় যাচ্ছিলি?’’

গলার সাংঘাতিক আওয়াজ শুনে বড়ভাই ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললেও ছোটভাই উত্তর দিল, ‘‘যাচ্ছিলাম আমাদের দেশে, নিজেদের গাঁয়ে ।’’

‘‘দেশের কী নাম? গ্রামের কী নাম? সেটা কোন দিকে?’’

গলার আওয়াজে বড়ভাই এবারও কেঁপে উঠলেও সে-ই যতটা সম্ভব স্পষ্ট গলায় উত্তর দিল, ‘‘দেশের নাম— আমাদের দেশ । গাঁয়ের নাম ছেঁড়াকাঁথা । দিক তো বলতে পারব না, বাবু ।’’

‘‘হেয়ালি রাখ! মিথ্যে বললে—’’ বলে লোকটা রিভলবার তাক করল, ‘‘সোজা কথা বল দেখি কোত্থেকে আসছিলি?’’

দাদা কথায় কথায় চমকে উঠছে দেখে ছোটভাই শান্ত গলায় বলল, ‘‘ইলিশ ধরতে বেরিয়ে নদীর ওপর দু-দেশের ভাগরেখা বুঝতে না পেরে ভিনদেশে ঢুকে পড়েছিলাম । সেখানকার পুলিশ তিন মাস জেলে পুরে রেখে আজই ছেড়ে দিল । সেখান থেকেই আসছি ।’’



লোকটা এবার সঙ্গের একজনকে হুকুম দিল, ‘‘দুজনকে এখনই পেট ভরে খেতে দে । সারাদিন এদের পেটে কিছু পড়েনি ।’’

সঙ্গে সঙ্গে বিরিয়ানি, চাঁপ, কাবাব, বিঘৎ সাইজের ইলিশ ভাজা, ক্ষীর, সন্দেশ বিরাট দুটো থালায় সাজিয়ে হাজির করা হল ।

“খেয়ে নে । এবার থেকে রোজ দুবেলা এরকমই খাবি । তার ওপর ইলিশ ধরে যে টাকা পাস তার চেয়ে ঢের বেশি টাকাও পাবি ।”

দুজনে খাবারের সামনে বসে পড়েছে । খিদে আর একমুহূর্তও সহ্য হয় না । বড়ভাই সবে এক থাবা বিরিয়ানি মুখের কাছে তুলেছে, ছোটভাই জাহাজের লোকটাকে বলল, “কেন এসব খাওয়াচ্ছেন? কেন এত টাকা দেবেন?”

“শুধু এদেশ থেকে নৌকোয় ওদেশে কিছু জিনিস পৌঁছে দিবি । সপ্তায় দু-তিনদিন মাত্র । ভুল পথে না, যাবি সোজা পথে । এই নদীতে দু-দেশে যাতায়াতের এরকম সোজা রাস্তা অনেক আছে, একবার চিনিয়ে দিলে দেখবি আর ভুল হবে না ।”



বড়ভাই দ্বিতীয় গ্রাস বিরিয়ানি মুখে নিয়ে হপ হপ করে বলল, ''খুব ভারি মালপত্র নয় তো বাবু?''

লোকটা উত্তর দেবার আগেই ছোটভাইয়ের প্রশ্ন, ''জিনিসগুলো কী?''

''হালকা, খুব হালকা। বিলিতি ঘড়ি, গাঁজার প্যাকেট, সোনার বিস্কুট এইসব ছোটখাটো জিনিস আর কী! একেবারে নির্ভাবনায় যাবি-আসবি। তোদের চেহারাটাই এমন যে তোরা সব সন্দেহের ঊর্ধ্বে। তাছাড়া তোদের নদীর অভিজ্ঞতাও একটা অ্যাসেট!''

''ইসমাগলিং?''

''স্মাগলিং বললে স্মাগলিং। ব্যবসা বললে ব্যবসা। রেলগাড়িতে, জাহাজে, প্লেনে মাল চালান যায় না? আম, গোলাপ, চা এক দেশ থেকে আরেক দেশে পাঠানো হয় না? এও তেমনই। শুধু দেখতে হবে কাকপক্ষী যেন টের না পায়!''

ছোটভাই তখনও হাতের বিরিয়ানি মুখে নেয়নি, এক ঝটকায় দাদাকে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ''খাসনি দাদা, খাসনি, এ অন্ন মুখে তোলবার নয়!''

রঙিন চেয়ারের লোকটা তেমনই বসে থেকেই শান্ত গলায় তার লোকদের বলল, ''এ দুটোকে আপাতত জাহাজের খোলে চালান করে দে।''

প্রায় অন্ধকার ঘুপচি খোলের মধ্যে বসে দুভাই আর ভয়ে চিৎকার করে কাঁদল না, দুঃখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়েও কাঁদল না, দুলে দুলে একে অন্যকে ছড়াও শোনাল না, শুধু চুপ করে বসে আপনমনে ভাবতে লাগল।

মা তাদের এত ভালোবাসত, সেই মায়ের কাছে আর যাওয়া যায় না, বাবা তাদের এত ভালোবাসত, এ-জীবনে সেই বাবার কাছে আর যাওয়া যাবে না, এত বড় দুঃখের ওপর এখন আবার এই বিপদ! শেষ পর্যন্ত তারা ঠেকল কিনা এসে এই শয়তানদের আস্তানায়!

এই ঘটনার পাঁচদিন পর দুভাই নিজেদের নৌকোয় নিজেদের গ্রাম ছেঁড়াকাঁথায় পৌঁছল। কী করে জাহাজের লোকদের চোখ এড়িয়ে পালাতে পারল, কী করে অচেনা নদী পার হয়ে নিজেদের গ্রাম খুঁজে পেল, কী করেই বা ওই পাঁচদিন বেঁচে রইল সেসব লিখে বোঝাবার শক্তি আমার তো ছাড়, এই পৃথিবীতে কারওই নেই। শুধু একটা কথাই সকলে লেখে যে বিপদে পড়লে মানুষের শক্তি যে কত দিকে কত বেড়ে যায় তার কোনও মাপজোক হয় না। তাছাড়া, ছেঁড়াকাঁথা গ্রামের সকলেই জলের পোকা। আর এই দুই ভাই তো নৌকো জলে ডুবিয়ে দড়ি বেঁধে দুজনে মিলে শুধু নাকটুকু জলের ওপর রেখে মাইলের পর মাইল নিঃশব্দে সাঁতার কাটতে পারে!

এদিকে জলজ্যান্ত তিনটে মানুষ, তার মধ্যে আবার দুজন বেশ ছোট, নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল দেখে ছেঁড়াকাঁথার সবাই তো

হা-হুতাশ করবেই । পাঁচ গ্রাম দূরে থানার নতুন দারোগার কানেও খবরটা পৌঁছেছিল । ফেরা মাত্রই তারা যেন তিনজনই থানায় গিয়ে সশরীরে হাজিরা দেয়— দারোগা নিজে এসে এই নির্দেশও দিয়ে গিয়েছেন ।

দুভাই যেদিন গ্রামে পৌঁছয়, তখন বিকেল শেষ হয়ে আসছে । সেদিন পেট ভরে প্রতিবেশীদের দেওয়া পান্তা ভাত নুন-লংকা দিয়ে খেয়ে সারা রাত নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পরদিন সকালে দুভাই থানায় দারোগাবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল ।

''তিনজনের বদলে মাত্র দুজন কেন'' বলে প্রথমে খুব হম্বিতম্বি করলেও দুই ভাইয়ের মুখে তাদের দুঃখ-দুর্দশার পুরো কাহিনী শুনে দারোগাবাবু একেবারে থ' । তারই মধ্যে একবার ''হুম'' শব্দ করে মস্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, ''বিরিয়ানি-চাঁপ-কাবাব পেয়েও ছেড়ে দেবে আমার এমন দশটা কনেস্টবলও যদি থাকত রে! ছেঁড়াকাঁথা, শালুকফুল, বিন্নিধানপুর— এদিককার এরকম দশ-বিশটা গ্রাম আমি ভগবানের দেশ করে দিতাম!''

পরদিনই দুভাইকে দারোগাবাবু নিজে গিয়ে ছেঁড়াকাঁথা গ্রাম থেকে তিন গ্রাম দূরের স্কুলে আবার ভরতি করে দিলেন । স্কুলের পড়া শেষ হলে তারপর যাতে এই থানাতেই ক্ষুদে পুলিশের পাকা চাকরিও হয় সে বিষয়েও তিনি দেশের সরকারকে চিঠি লিখবেন ঘোষণা করে দিলেন । তাঁর মতে, ছোটদেরই পুলিশ হওয়া মানায় । কেননা তাদের মনে সাহস আছে, কিন্তু লোভ নেই । বড়দের এর ঠিক উল্টো । মন-ভরা লোভ, আর সাহস যেন ভিজে দেশলাই!





আলাস্কার সোনা

১

আলাস্কার রাজধানী জুনোর রাস্তায় দেখলাম

অনেকেই প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে আছে। কে কত কম খরচে সমুদ্রে তিমি দেখাতে নিয়ে যাবে, প্ল্যাকার্ডে সেসব কথাই লেখা।

আমি আলাস্কা এসেছি একটা বাংলা টিভি চ্যানেলের জন্য খুব কম খরচে আলাস্কার ওপর স্বল্পদৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র তৈরির কাজ নিয়ে।

কলকাতা থেকে লস এঞ্জেলেস হয়ে আলাস্কার অ্যাঙ্কারেজ পর্যন্ত যাওয়া-আসার বিমানভাড়া, আর খুব বেশি হলে পনেরো দিন আলাস্কায় খুব কম খরচে থাকা-খাওয়া ঘোরাঘুরির খরচটুকু শুধু পেয়েছি। এর ওপর দশটা মিনি ডিভি ক্যাসেট। ব্যস। ক্যামেরা আমার নিজের। ছবি তোলার কোনও পারিশ্রমিকও পাওয়া যাবে না, তা সত্ত্বেও একদম একা, হাতে ছোট্ট একটা ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে এমন একটা ঝক্কির কাজ কাঁধে নিয়েছি শুধু আলাস্কা দেখার লোভে।

ছবি করার প্রস্তাবটা আমারই, নামমাত্র খরচ বলেই টিভি চ্যানেল রাজি হয়েছে। এমনিতে আলাস্কার অরণ্য, পাহাড়, হিমবাহ, হ্রদ, নদী, তুষার, বন্যপ্রাণী, সাগর-উপসাগর ইত্যাদি নিয়ে খুব ছোট একটা তথ্যচিত্রের প্রোডাকশনের কাজেও অন্তত চার-পাঁচজনের একটা দল আর দামি বড় ক্যামেরা দরকার হয়। সে তুলনায় একা হাতে সামান্য একটা ভিডিও ক্যামেরায় ছবি করার খরচ কিছুই না!

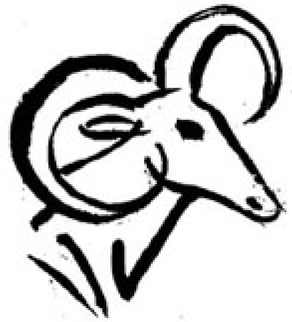
গত পরশু ইয়াকটাট উপসাগরের মাথায় হাবার্ড গ্লেসিয়ারের ছবি তুলে আজই জুনোয় এসেছি। উত্তর আমেরিকার দীর্ঘতম গ্লেসিয়ার হাবার্ড। গ্লেসিয়ারের গা থেকে মেঘগর্জনের মতো শব্দ করে যখন তুষারধস প্রবল গতিতে সাগরে এসে পড়ছিল সেই দৃশ্যও ক্যামেরাবন্দি করেছি। আমার ছোট ক্যামেরায় অত দূরের শব্দ ধরা পড়বে না ভেবে খুবই খারাপ লাগছিল।



জুনোর মেনডেলহল গ্লেসিয়ারও ভারি সুন্দর, মুগ্ধ হয়ে দেখতে হয় । বরফ শত শত বছর ধরে জমাট বেঁধে গ্লেসিয়ার হয় । বরফের ফাটল থেকে নীল আভা ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল । ভোরের আলোয় মেনডেলহল গ্লেসিয়ারের ছবিও চমৎকার হয়েছে ।

জুনোর জাহাজঘাটায় একদিকে ‘আলাস্কা গ্রে লাইন’ বাসের হাতছানি, আরেকদিকে তিমি দেখতে যাবার হাঁকডাক । জল থেকে তিমির গা ঝাড়া দিয়ে ওঠার ছবি তো তুলতেই হবে । সবচেয়ে কম খরচে কারা নিয়ে যাবে, তাই নিয়ে একজনের সঙ্গে দরাদরি করছি, হঠাৎ আমার পিছনেই আচমকা হইচই শুনে ফিরে দেখি অনেকে মিলে একটা লোককে জাপটে ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে । মনে হয় আমার কাছ থেকে লোকটাকে সরিয়ে নেওয়াই উদ্দেশ্য ।

তিমি দেখতে যাবার ব্যাপারে আমি যার সঙ্গে কথা বলছিলাম, তাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম সে এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানে না । তবে শুনেছে যাকে অনেকে মিলে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল সে লোকটা পাগল । তাকে নাকি আলাস্কার নানা বন্দরে প্রায়ই দেখা যায় ।



ভদ্রলোককে আমি যতটুকু দেখলাম, তাতে তাঁকে একটুও পাগল মনে হয়নি । বেশ ভদ্র, সুস্থ লোক বলেই মনে হয় । সেকথা জানাতেই তিমি দেখানোর এজেন্ট-ছেলেটো বলল, “প্রায় মাসখানেক ধরে ভদ্রলোককে এখানে দেখছি । নতুন জাহাজ এলেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে । কালও এঁকে এদিকে ঘুরতে দেখেছি ।”

ভিডিও ক্যামেরায় বেশ কিছুক্ষণ তিমির ছবি তুলে ভারি আনন্দ হল । একসঙ্গে তিনটে তিমিও দেখলাম । জল থেকে লাফিয়ে ওঠারও চমৎকার ছবি হল ।

এর কয়েকদিন পরে আলাস্কার আগেকার রাজধানী অ্যাঙ্কারেজে শনিবারের হাটে প্রায় সারাদিন ঘুরে বেড়ালাম । প্লেন থেকে প্রথমে অ্যাঙ্কারেজেই নেমেছিলাম । পরদিনই হাবার্ড

গ্লেসিয়ারে যাবার একটা চমৎকার সুযোগ পেয়ে জাহাজে ইয়াকটাটে চলে গিয়েছিলাম । সেখান থেকে জলপথে জুনো হয়ে নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে অ্যাঙ্কারেজে ফিরেছি ।

হাট বেশ বড় । কতরকম জিনিস যে কেনাবেচা হচ্ছে বলে শেষ করা যাবে না । মানুষের সংসারে যা কিছু লাগে, সবই এখানে মিলবে । শিল্পীদের হাতে গড়া নানারকম শিল্পসামগ্রী, আঁকা ছবিও রয়েছে ।

অ্যাঙ্কারেজের এই বাজার সপ্তাহে শুধু দুদিন বসে । শনিবার আর বুধবার । সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ।

এক বৃদ্ধ শিল্পী পাথরের ওপর আঁকা বল্গা হরিণ, মুশ, লাল ও কালো ভালুক ও বল্ড ঈগলের ছবি সাজিয়ে বসেছে । প্রত্যেক প্রাণীর ছবি তুলে নিলাম । শিল্পীর মুখটাও না তুলে পারলাম না । তাঁর আঁকিবুঁকি ভরা মুখ থেকে শীতকালের দুর্বিষহ দিনযাপনের দুচারটে কথাও রেকর্ড করলাম । সারাজীবন ছবি এঁকেও এই বৃদ্ধবয়সে খুব একটা সুখে স্বাচ্ছন্দে নেই ।

বৃদ্ধের মুখের কথায়, পাথরের ছবিতে এতই মগ্ন ছিলাম যে প্রায় আমার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে একটা লোক যে আমাকেই তন্নতন্ন করে দেখছে খেয়াল হয়নি । লোকটা খপ করে আমার একটা হাত ধরতেই চমকে উঠলাম । ঝটকা মেরে হাতটা ছাড়াতে গিয়ে টের পেলাম খুব শক্ত মুঠোয় ধরেছে । আর কী সাংঘাতিক চোখ । যেন আমার ভেতর পর্যন্ত নিমেষে দেখে নিতে চায় ।

"ছাড়ো, ছাড়ো, ছাড়ো ওকে!" বলতে বলতে হুড়মুড়িয়ে বৃদ্ধ শিল্পীই উঠে এসে জোড়াপাঞ্জায় লোকটার কব্জিতে একটা কোপ মারল । তাতেই লোকটার হাত ছেড়ে গেল ।



আমার খুব কাছাকাছি লোকজনও প্রথমে কী ঘটেছে বুঝতে পারেনি । শিল্পীর তৎপরতা দেখে নিমেষেই তারা আমার আক্রমণকারীকে জাপটে ধরল । আশপাশের অন্য লোকেরাও

ব্যস্ত হয়ে দৌড়ে এল।

"আরে, এ তো সেই পাগলটা!"

ভিড়ের মধ্যে একজনকে একথা বলতে শুনেই আমারও ঝাঁ করে মনে পড়ে গেল একেই তো জুনোর বন্দরে দেখেছিলাম! লোকেরা জাপটে ধরে আমার কাছ থেকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানেও কি আমাকেই আক্রমণ করতে আসছিল নাকি!

কী ব্যাপার? খোঁজখবর করে যা জানলাম তা বিশ্বাস করা শক্ত। এমন অদ্ভুত ঘটনাও ঘটে নাকি!

যে লোকটা 'আরে এ তো সেই পাগলটা!' বলেছিল সে-ই আমার কাছে এগিয়ে এসে বলল, "সত্যি-মিথ্যে জানি না, তবে ফেয়ারব্যাঙ্কসের অনেকেই বলে— বিশ শতকের গোড়ায় যেসব বিদেশি আলাস্কায় সোনার খোঁজে এসে শেষ পর্যন্ত সোনার খনি আবিষ্কার করেছিলেন, এর ঠাকুরদা তাঁদেরই একজন।"

শুনে এক বৃদ্ধা বললেন, "ঠাকুরদা না, এর বাবা গত শতাব্দীর মাঝামাঝি স্পেন থেকে এখানে এসে সোনার খোঁজ পেয়েছিল। টন টন গোল্ড ওর বা আকরিক সোনা থেকে ছেঁকে সোনা বের করার কাজে এখানকার অনেক লোককে বহাল করেছিল। তাল তাল সোনায় মেতে গিয়ে লোকটা আলাস্কার আসল সোনাকে চিনতে পারেনি। তার ছেলেটা ছিল সত্যিই সোনার ছেলে। আলাস্কার অরণ্য পশুপাখি ছিল তার প্রাণ। দিনের বেশিরভাগ সময় সে বনে থাকতেই ভালোবাসত। বনে বনে ঘুরে বেড়াত আর আপনমনে বনের পশুপাখিদের ছবি আঁকত। কাগজে কাঠে পাথরে আঁকা তার ছবি যারা নিজের চোখে দেখেছে তারা সেসব জীবন্ত ছবির কথা আজও বলাবলি করে। যাই হোক, একদিন কাউকে কিছু না বলে বালকপুত্রটি নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। ছেলেটির বাবা, এই যে আপনাকে ধরেছিল, সে ছাড়া আর সকলেরই ধারণা ছেলেটি হয়তো ভালুক বা নেকড়ের আক্রমণে মারা গেছে। শুধু কাছাকাছি জঙ্গলেই নয়, দূর দূর অরণ্যেও অনেক খোঁজাখুঁজি করে তার দেহ পাওয়া যায়নি। ছেলেটির বাবা তার মৃত্যু বিশ্বাস করে না। তাঁর ধারণা, বাবার সোনার লোভ দেখে ক্ষোভে অভিমানে ছেলে বাবাকে ছেড়ে দূর বিদেশে চলে গেছে। সেই থেকে আলাস্কার নানা জায়গায়, শহরে, বাজারে, বন্দরে, বিশেষ করে যেসব জাহাজঘাটায় বিদেশি জাহাজ আসে, সেসব জায়গায় সে তাঁর ছেলেকে খোঁজে। আপনার গায়ের রং, কালো চুল, খানিকটা স্প্যানিশদের মতো মুখের গড়ন দেখে হয়তো লোকটা আপনাকে হারানো ছেলে বলে সন্দেহ করেছে। ছেলের শোকে লোকটা বোবা হয়ে গেছে, একেবারেই কথা বলতে পারে না।"

মানুষের কতরকম দুঃখ থাকে ভেবে মন আমার ভারি হয়ে ওঠে । ওই বৃদ্ধ শিল্পী, এই সন্তানহারা সোনার মালিক, এই যারা নিজেরাই আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল— সকলেরই হয়তো আলাদা আলাদা জীবন, আলাদা আলাদা সুখ দুঃখ । ক্যামেরার ছবিতে তার কতটুকুই বা ধরা পড়ে?

বাজারটা মূল শহর থেকে অনেকটা নীচে, বিরাট চওড়া সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলাম ।

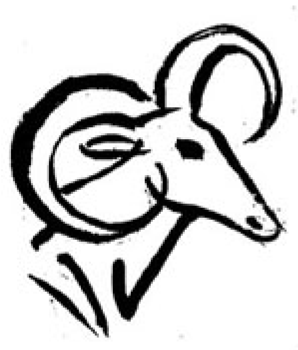
এরপর আরও দুদিন ছিলাম অ্যাঙ্কারেজে । সে মানুষটার সঙ্গে আর দেখা হয়নি । তৃতীয় দিনে অ্যাঙ্কারেজ স্টেশনে ট্রেনে উঠতে যাচ্ছি, হঠাৎ কী মনে হল, পিছনে তাকিয়েই লোকটাকে যেন এক পলকের জন্য দেখলাম । দু-কামরা পিছনের কামরায় উঠল কি? তা কী করে হবে! হয়তো আমারই চোখের ভুল! নাকি ওর মাথায় সত্যিই ঢুকে গেছে যে আমিই ওর হারানো ছেলে! টালকিটনায় নেমে খুব সস্তার হোটেলের খোঁজ করতে করতে এখানকারই এক মহিলার কাঠের তৈরি তিন ঘরের ছোট্ট হোটেলে জায়গা পেয়ে গেলাম । ভাড়া জুনো বা অ্যাঙ্কারেজের চেয়ে বেশ কম ।

২

রাত চারটেয় দরজায় খটখট শব্দ করে আলেক আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিল । বন্ধ জানলার কাচে তখনই সকালের রোদ দেখে আমি উঠে দরজা খুলে দিলাম ।

আলাস্কায় বছরের এই সময়টা একুশ-বাইশ ঘণ্টা দিনের আলো, রাত হয় দু-আড়াই ঘণ্টার জন্য । রাত দুটোয় আমি যখন শুতে গিয়েছিলাম তখনও অস্ত সূর্যের ছটায় আকাশ রাঙা হয়ে ছিল ।

আলেকের হাতে তিমির হাড়ের তৈরি সেই হাতুড়ির মতো জিনিসটা । ওটাই সে আবারও দুবার দরজায় ঠুকে বলল, তোমার জন্য খবর আছে । ডেনালিতে পাহাড়ি নদীর ধারে জঙ্গলের মাথায় ক'দিন ধরে খুব গোল্ডেন ঈগল দেখা যাচ্ছে । কাল সন্ধেয় একটা বল্গা হরিণের বাচ্চাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যেতে দেখেছে এই হোটেলের পরিচারিকা কাম রাঁধুনি কাম মালকিনের বোন । সে ডেনালিতে স্যামন মাছের দোকান চালায় । টেলিফোনে দিদিকে এই খবর দিয়ে তোমাকে জানাতে বলেছে— যদি তুমি ঈগলের ভালো ছবি তুলতে চাও, তাহলে টালকিটনায় বসে না থেকে বিকেলের ট্রেনেই ডেনালি চলে এসো । ভাগ্যে থাকলে ডেনালিতে তুমি গ্রিজলি বেয়ারও (বাদামি ভালুক) দেখতে পাবে ।



সামান্য একটা ছোট ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে সুদূর ভারত থেকে একলা একটা লোক টিভির জন্য আলাস্কার ছবি তুলতে এসেছে শুনে ওই দু-বোনের মধ্যে নাকি আমাকে নিয়ে অনেক মজার মজার কথা হয়েছে। আলেক তার মা ও মাসি সম্পর্কে যেভাবে আমাকে বলল সেটাও কম মজার নয়।

টালকিটনায় প্রাকৃতিক দৃশ্যই বেশি ক্যামেরাবন্দি করেছি। গতকালই টালকিটনা নদীতে নৌকো চড়েও নদীর নতুন বাঁক, পুরনো ব্রিজ ও সবুজ তীরভূমির ছবি তুলেছি। নদীর কিনারে বিভারদের অদ্ভুত কৌশলে কেটে রাখা বড় বড় গাছের স্তূপ, জলের ওপর শুয়ে পড়া গাছের ফাঁক দিয়ে স্রোত বয়ে যাচ্ছে, এই উভচর লোমশ জন্তুরা দল বেঁধে বাসা বাঁধবে বলে এভাবে গাছ কেটে নদীতে বাঁধ দেয়।

টালকিটনা থেকে ডেনালি ঘণ্টাপাঁচেকের পথ। দিনের প্রথম ট্রেনে রওনা হলে বিকেলের অনেক আগেই পৌঁছে যাব। ঈগল এখনও ভালো মতো তুলতেই পারিনি। ফলে ডেনালি যাওয়াই ঠিক করলাম। গত পাঁচদিন ধরে আলাস্কার নানা অঞ্চলে আমার ছোট্ট ভিডিও ক্যামেরায় ছবি তুলে বেড়াচ্ছি, শুধু ঈগল নয়, এখনও পর্যন্ত গ্রিজলি বিয়ারও দেখার সুযোগ পাইনি। তাছাড়া কলকাতা ছাড়ার দুদিন আগেই খবরের কাগজে দেখে এসেছি ডেনালি ন্যাশনাল পার্কে ডাইনোসরের পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে। সেটারও একবার খোঁজখবর করা দরকার।

আলাস্কা রেল রোডের এই ট্রেনের কোনও তুলনা হয় না। চোখে দেখেই বেড়াবার আনন্দে মন ভরে যায়। লাল আর সোনালি রঙের ইঞ্জিন। বগিগুলো লাল আর নীলে। দু-তিন মিনিটে যতটুকু পারলাম ট্রেনের ছবি তুলে নিলাম।

জানলার ধারের সিটে বসেই মন আনন্দে নেচে উঠল। ট্রেন চলেছে ঘন সবুজ বনের মধ্যে দিয়ে, হঠাৎ হঠাৎ নদী, তারপর পাহাড়শ্রেণী। কোথাও সবুজে ঢাকা। কোথাও বরফে ঢাকা। রেললাইনের ধারে উজ্জ্বল গোলাপি রঙের লম্বা ছোপ— ফায়ারউইড ফুলের সারি। এ কদিনে আলাস্কার যেখানেই গেছি সব জায়গায় দেখেছি প্রচুর ফায়ারউইড ফুটে

আছে । ট্রেন থেকে রেললাইনের দুধারেই দেখছি মাইলের পর মাইল গোলাপি হয়ে আছে । আলাস্কার জাতীয় ফুল নীল রঙের ফরগেট-মি-নটের চেয়েও ফায়ারউইড অনেক বেশি দেখেছি । আগাছা যেমন যতই কাটো নির্মূল করা মুস্কিল, শুনেছি এই ফায়ারউইডও তেমনই, আগুন লেগে পুড়ে যাবার পরও খুব দ্রুত আবার ফুটে ওঠে, সেই জন্যই এর নাম ফায়ারউইড । আলাস্কার আদিবাসীদের বিশ্বাস, গাছের একেবারে মাথার ফুল ফুটে গেলে নিষ্ঠুর ভয়াবহ শীতকাল আর মাত্র ছ সপ্তাহ দূরে!

চলন্ত ট্রেন থেকে সেই ট্রেনেরই ছবি নেওয়া খুব মুস্কিল । ট্রেনটা যখন বাঁক নিচ্ছে, তখন ট্রেনের দরজা দিয়ে যতটা সম্ভব শরীর ঝুঁকিয়ে ট্রেনের ছবি তুলছি । বাঁদিকে মোড় ঘুরলে আমিও দৌড়ে বাঁদিকের দরজায় ক্যামেরাসুদ্ধ শরীরটা গলিয়ে দিচ্ছি । ডানদিকে মোড় ঘুরলে ডানদিকের দরজায় একই ভাবে ঝুঁকতে হচ্ছে ।

ডেনালি স্টেশনে (এরা বলে ডিপো) নেমে একটু এদিক-ওদিক তাকাতেই চোখে পড়ল পনেরো-ষোল বছরের একটা মেয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে । মেয়েটার মাথায় মুশ-এর শিং লাগানো । শিংটা খুবই ছোট, অনেকটা মুকুটের মতো দেখাচ্ছে । আলাস্কার আদি বাসিন্দাদের বাড়ির মাথায় বড় বড় মুশের শিং লাগানো থাকে দেখেছি, মানুষের মাথায় দেখলাম এই প্রথম ।

মেয়েটা আমার কাছে এসে হেসে ইংরিজিতে বলল, ‘‘তুমি নিশ্চয়ই অ্যামারান্দা? তাই না? আমার নাম আইদা, তোমাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে এসেছি ।’’

‘‘তুমি ইংরিজিতে কথা বলছ কেন! তোমরা কি আমেরিকান?’’

‘‘আমরা এস্কিমো (মেয়েটার উচ্চারণ অনুযায়ী ‘অ্যাস্কিমো’) । কিন্তু ইংরিজি ছাড়া তোমার সঙ্গে কথা বলতাম কী করে । তুমি ইন্ডিয়া থেকে ছবি তুলতে এসেছো তো?’’

‘‘আমাকে তুমি চিনলে কী করে?’’

‘‘তোমার মতো গায়ের রং, চুলের রং, মুখের গড়ন নিয়ে এই ট্রেন থেকে তো শুধু একজনই নামল ।’’

মেয়েটা এস্কিমো, অথচ কথা বলছে আমেরিকান ইংরিজিতে । ওর সঙ্গে স্টেশনের বাইরে এসে একটু সন্দেহ নিয়েই বললাম, ‘‘তোমাদের হাস্কি কুকুরে টানা স্লেজ গাড়ি আছে?’’

আইদা এবার মাথায় বাঁধা মুশের শিং খুলে হাতে নিয়ে যা বলল, তার অর্থ— ওরা এস্কিমো হলেও অনেক দূরে ওদের আদি গ্রামে এখন আর থাকে না । শহুরে মানুষের, বিশেষ করে আমেরিকানদের প্রভাবে ওরাও একটু একটু করে অনেকটা বদলে গেছে । শহরের মানুষদের মতো ওরাও ট্রেনে-বাসেই ঘোরাঘুরি করে । হাতের শিংটা আমার

সামনে তুলে ধরে হেসে যোগ করল, ‘‘কিসের শিং বলো তো? মুশের । এই শিং কেউ কিন্তু মাথায় পরে না । তোমাকে চমকে দেব বলে মজা করে পরেছি ।’’

‘‘তবে আমার মা সাবেকি এস্কিমো পোশাক, এস্কিমো খাদ্যাভ্যাস ছাড়ার কথা ভাবতেও পারে না । আমার দাদুর দেশে গেলে তুমি স্লেজগাড়িও দেখতে পাবে । সেখানে সব বাড়িতেই হাস্কি ডগ থাকে । আর দেখবে প্রচুর ক্যারিবু ।’’

ক্যারিবু মানে বল্গা হরিণ । এসব শুনতে শুনতে আমার কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছে দেখে আইদাও উৎসাহ নিয়ে বলে চলল, ‘‘আমরা আসলে ইনুপিয়াৎ অ্যাস্কিমো । আমাদের আদি বাড়ি আলাস্কার উত্তরাঞ্চলে । সেখানকার আবহাওয়া অতি নিষ্ঠুর । সেখানে আমাদের থাকা, খাওয়া, পরা— সব কিছুর জন্যই নানা ধরনের প্রাণী শিকার করতে হয় । ঘর গরম রাখতে ছাদে ঘাসের চাপড়া দিয়ে ঢাকা তিমির হাড় রাখা হয় । সব বাড়িতেই সিল মাছের তেলের প্রদীপ থাকে । আলোই বলো, তাপই বলো, আর রান্নার জ্বালানি বলো সব ওই সিল তেলের আগুন থেকে । তিমি, সিল, সিন্ধুঘোটক, বল্গা হরিণ, মাছ— এইসব নিয়ে সেখানে মানুষের জীবনযাপন । আর এর মূলে আছে মানুষ আর প্রাণীদের পুনর্জন্মে আমাদের গভীর বিশ্বাস ।’’

স্টেশন এলাকা ছাড়িয়ে একটা পাহাড়ি নদীর ধারে পৌঁছলাম । প্রায় গোলাকার একটা ডোঙা তীরের বড় পাথরের চাঁইয়ের সঙ্গে আটকানো । প্রথমে আমার সুটকেস রেখে পরে আমাকে নিয়ে উঠে বসল আইদা । নদীতে খুব স্রোত । মাথা উঁচু করে ওপরের নদীতীর ও তারও ওপরের পাহাড়ের সারি দেখতে হয় । আইদাদের গ্রাম ডেনালির শহর এলাকা থেকে বেশ কিছুটা দূরে ।

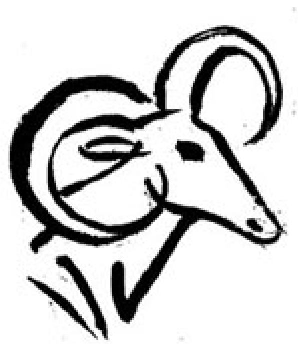
ডোঙা থেকে তীরে নেমে পাহাড়ি রাস্তা ধরে কয়েকটা ছোট ছোট দোকান পেরিয়ে আইদাদের বাড়ি । বাড়ির সামনে দেখলাম গাছপালাময় উঠোনের মতো খানিকটা জায়গার পরই সামনের ঘর । ঘরের ছাদে আট-দশ ইঞ্চি পুরু ঘাস, দরজার ওপর দিকে বেশ বড় একটা মুশের শিং আটকানো ।

আইদার মায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় আমার সম্পর্কে আইদা নিজেদের ভাষায় কী বলল বোঝবার উপায় নেই । আমাকে অবশ্য ইংরিজিতে বলল যে তার মা বড়বোনের কাছে আমার বিষয়ে অনেক কথা শুনেছে ।

‘‘সত্যি বলতে কী, তোমার না আছে ফার (পুরু লোমের পশুচামড়ার পোশাক), না আছে একটা সামান্য উলু (কুডুলের ফলার মতো ভারী লোহার ধারালো অস্ত্র, সাধারণত মেয়েরা সবজি ইত্যাদি কাটার কাজে ব্যবহার করে) । তুমি এসেছো আলাস্কায় টিভির ছবি তুলতে জেনে দুই বোনে বেশ খানিকটা হাসাহাসিও হয়েছে ।’’

এ যেন সেই আমাদের ঢাল নেই, তলোয়ার নেই গোছের প্রবাদ । টালকিটনায় মা-ছেলের তিন ঘরের ছোট্ট মোটেল আর ডেনালিতে মা-মেয়ের আরও ছোট মোটেলে নিয়মিত ফোনে গল্পসল্প চলে বোঝা গেল । আইদার কথা শেষ হতে না হতেই তার মা একটা অদ্ভুত বাটির মতো পাত্রে কিছু খাবার এনে আমার সামনে ধরে হাত মুখের ইঙ্গিতে আমাকে খেতে বলল । এদের বাড়িতে সবে এসেছি, তার ওপর একেবারে অচেনা খাবার, আমাকে একটু দ্বিধান্বিত দেখে আইদা বলল, ‘‘এটা আমাদের খুব প্রিয় একটা পদ । বিশিষ্ট অতিথিকে দিতেই হয় । খেয়ে দেখো, তোমারও নিশ্চয়ই ভালো লাগবে ।’’

‘‘এটা কী?’’



‘‘রেন ডিয়ারের সসেজ ।’’

সসেজ একেবারে খাই না তা নয়, তাই বলে রেন ডিয়ার! গত কদিন এদের এত ছবি তুলেছি । বড় ডালপালাময় শিং, কিন্তু ভারি নিরীহ । বল্গা হরিণের বড় বড় চোখ আমার মনে একবার ভেসে উঠল ।

মনের ভাব গোপন করে হেসে বললাম, ‘‘আলাস্কায় আমি সবচেয়ে কী খেতে ভালোবাসি জানো? স্যামন আর হ্যালিবুট মাছ । স্যামন, তা সে লাল কিং স্যামনই হোক, আর কালো ছোট স্যামনই হোক, স্মোকডই হোক আর গ্রিলডই হোক, একবার খেলে স্বাদ ভোলা যায় না । আর ধপধপে সাদা হ্যালিবুট তুমি আগুনে একটু সেঁকে দাও কি ভাপিয়েই দাও, বড্ড ভালো খেতে ।’’

‘‘মা আবার দূর বিদেশের অতিথিকে বেশি খাতির করে রেন ডিয়ারের সসেজ খেতে দিয়েছে, স্যামন তো বাড়িতে কত আছে । মা’র তো স্যামনেরই দোকান ।’’

মেয়ের কাছে বুঝে নিয়ে এবারও কয়েক মিনিটের মধ্যে একই ধরনের আরও একটু বড় পাত্রে বেশ বড় দুটুকরো গ্রিলড স্যামন এনে দিলেন । সঙ্গে প্রায় বেলের মতো

সাইজের আধখানা পেঁয়াজ আর কয়েক টুকরো খটখটে পাউরুটি ।

পরদিন খুব সকালে আমরা ডেনালি ন্যাশনাল পার্ক অ্যান্ড প্রিজার্ভে ঢুকলাম । ডেনালি ন্যাশনাল পার্কে প্রায় সওয়াশো জোড়া সোনালি ঈগলের বাসা । পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শিকারি পাখি সোনালি ঈগল । এই ঈগলের ছবি তুলতেই ডেনালি আসা । সারাদিন থেকে দুজনে হেঁটে হেঁটে ঘুরব । আইদা পিঠের ব্যাগে দুজনের জন্যই অনেকটা স্যামন মাছের পেস্ট আর পিসবোর্ডের মতো পুরু কিন্তু পাঁপড়ের মতো মুচমুচে রুটি জাতীয় কিছু অনেকগুলো নিয়েছে । চামড়ার মোটা বোতলে খাবার জলও আছে ।

টালকিটনায় আইদার মাসির তিন-ঘরের হোটেলে থাকা-খাওয়ার জন্য আমাকে দৈনিক দিতে হত মাত্র দশ ডলার । আমাদের দেশের হিসেবে সাড়ে চারশো টাকা । আইদাদের হোটেলে ঠিক কত দিতে হবে সেটা ঠিক হয়নি । দুই বোনে টেলিফোনে কথা বলে আমার এখানে সোনালি ঈগলের ছবি তোলার নিমন্ত্রণ আর এদের হোটেলে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে । ভাড়া কত দিতে হবে—আইদার মধ্যস্থতায় তার মাকে বার কতক জিজ্ঞেস করেও কিছু জানতে পারিনি । শুধু আইদার মায়ের মুখের হাসি দেখে বুঝেছি ভাড়া নিয়ে মাথা ঘামাবার খুব একটা দরকার নেই ।

বেলা প্রায় দশটা বাজতে গেল, অনেক দূরে নিচু উপত্যকায় একটা মুশ আর আকাশের খুব উঁচুতে একটা মাত্র ঈগল ছাড়া অন্য কোনও পশু বা পাখি চোখে পড়েনি ।

আমার কিছুটা হতাশ ভাব লক্ষ করে আইদা হেসে বলল, "তুমি কি ভাবছ জন্তুর দল তোমার ক্যামেরার সামনে এসে পোজ দিয়ে দাঁড়াবে! বনের প্রাণীরা বনের গভীরে নিজেদের মতো চরে বেড়ায় । কখনও কখনও মানুষের দৃষ্টিসীমার মধ্যে চলে আসে । ডেনালির এই ন্যাশনাল পার্ক ষাট লক্ষ একর জায়গায় ছড়ানো । আর বিভিন্ন প্রাণীর সংখ্যা কত জানো?"

ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট বই বের করে আইদা বলে চলল, "তোমার জন্যই এটা এনেছি । শোনো— এখানে সতেরোশো ক্যারিবু, দুহাজারের মতো মুশ, আড়াই হাজার ডল শিপ, তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো গ্রিজলি বিয়ার আর একশো নেকড়ে আছে । এরা হল ডেনালি ন্যাশনাল পার্ক অ্যান্ড রিজার্ভের বাসিন্দা বা বিচরণকারী । এখানে ১৬০ প্রজাতির পাখি, ৩৭ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী আর শত শত প্রজাতির উদ্ভিদের বাসা ।"

আইদা ঠিকই বলেছে, বন্যপ্রাণী দেখতে ধৈর্য ধরতে হয় । তাছাড়া হয়তো চারদিকে ভালো করে নজর করাও হয়নি । নজর করব কী, দুচোখ ভরে আছে তুষারে ঢাকা ম্যাককিনলে পর্বতশৃঙ্গ । ২০,৩২০ ফুট উঁচু । উত্তর আমেরিকার সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ । ডাইনে

বাঁয়েও অনেক দূর অবধি ছড়ানো আরও নানা শৃঙ্গ সহ এ এক বিশাল পর্বতমালা। ভোরবেলা নেপালের নাগারকোট বা ধূলিখেল থেকে দেখা হিমালয় শৃঙ্গশ্রেণীর মতো দীর্ঘ।

পাহাড়ের ছবি তোলা শেষ করে নিচে তুন্দ্রা অঞ্চলের তৃণভূমিতে চোখ নামাতেই দেখি ছাগলের মতো মুখ ও বাঁকা শিংওলা ধপধপে সাদা ভেড়ার পাল। এই ভেড়াদের এখানে বলে ডল শিপ। ডেনালি ন্যাশনাল পার্কের প্রধান পাঁচটা প্রাণী হল ক্যারিবু, মুশ, ডল শিপ, গ্রিজলি বেয়ার বা বাদামি ভালুক, নেকড়ে।

পাহাড়ের গায়ে সবুজ ঘাসে সাদা ডল শিপের পাল— সরল মুখ, বাঁকানো শিং— বেশ খানিকক্ষণ নানাভাবে ক্যামেরাবন্দি করলাম।

একদম একা, এক চোখ বুজে এক চোখ ক্যামেরায় লাগিয়ে, ছবি তোলার একটা মুস্কিল হল যে-দৃশ্যের ছবি তুলছি, তার বাইরে আর কিছু দেখার উপায় থাকে না।

ছাগলমুখো ভেড়ার ছবি তোলা শেষ হতেই ক্যামেরার ভিউ ফাইন্ডার থেকে চোখ তুলে বিস্ময়ে যেন দম বন্ধ হয়ে এল। ভেড়ার পাল থেকে বেশ খানিকটা পিছনে, পাহাড়ের ওপরের দিকে একটা ভেড়ার বাচ্চাকে এক ছোঁয়ে তুলে নিয়ে গেল একটা ঈগল। ছোঁ মারার মুহূর্তটা মিস করলেও, উড়ন্ত ঈগলটার দুপায়ের আঙুলে আঁকড়ে ধরা ভেড়ার বাচ্চার ছবি খুব ছোট হয়ে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ক্যামেরায় ধরে রাখলাম।

বরফে ঢাকা মাউন্ট ম্যাককিনলে আর এই ঈগলের মেষশাবক শিকার, প্রায় একসঙ্গেই প্রকৃতির পাগল করা রূপ আর বুক মোচড়ানো রীতি দেখে আমার মনে ঠিক কীরকম অনুভূতি হয়েছিল তা লিখে বোঝাতে পারব না।

যেতে যেতে এক জায়গায় চোখে পড়ল অনেকখানি জায়গা জুড়ে প্রচুর বেরি হয়ে রয়েছে। মুখে দিয়ে দেখি দারুণ স্বাদ। জায়গাটা একদম নির্জন, নিচের উপত্যকায় সরু একটা নদী এঁকেবেঁকে দিগন্তে পর্বতমালার নীচ পর্যন্ত চলে গিয়েছে। চারদিকে পাঁচ-সাত মাইলের মধ্যে কোথাও কিছু আছে বলে মনে হয় না। খিদেও পেয়েছে খুব। এখানেই আমরা বসে পড়ে লাঞ্চ খেতে শুরু করলাম। শক্ত মোটা পাঁপড়ের মতো জিনিসটা ভেঙে ভেঙে একেকটা টুকরোয় স্যামনের পেস্ট মাখিয়ে খেতে দারুণ লাগছে।

খেতে খেতে আইদাকে প্রশ্ন করে আলাস্কার অরণ্য প্রকৃতি মানুষ সম্পর্কে নানা কথা জেনে নিচ্ছি। আইদাও আমার সম্পর্কে কৌতূহলী। আমাদের দেশ সম্পর্কে, বিশেষ করে আমাদের দেশের মেয়েদের সম্পর্কে জানতে চাইছে, আমিও তার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি, খাওয়া শেষ হয়ে এসেছে, আইদা মাটি থেকে কী একটা পাখির পালক তুলে নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে ধরে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, "বলো তো তুমি এখন কোন দেশে আছো?"



"কেন, আলাস্কায়!"

"আলাস্কা তো আলাদা কোনও দেশ না।"

"তাই বলো, তাহলে আছি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে।"

"সে তো রাজনৈতিক ভূগোলের হিসেবে। আসলে কিন্তু এটা রাশিয়া। রাশিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চলের কথা তুমি শোনোনি? এই হল সেই তুন্দ্রা। পাহাড়ের গায়ে উঁচুতে যত ঘন সবুজ নিচু ঝোপের বিস্তার, শীতকালে সব পুরু বরফের নীচে চাপা পড়ে যাবে। শীতের শেষে বরফ গললেই আবার যে কে সেই। সবুজ যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠবে। দেখে অবাক হয়ে যাবে একেবারে যেমন ছিল সব ঠিক তেমনই আছে।"

আগে আলাস্কা যে রাশিয়ার ছিল সেটা আমারও অজানা নয়। কবে কীভাবে আমেরিকার হয়ে গেল জানতাম না। আইদা জানাল, ১৮৬৭ সালে রাশিয়ার জারের কাছ থেকে নামমাত্র টাকায় আমেরিকা আলাস্কা কিনে নেয়। তার অনেক পরে ১৯৫৯-এর ৩ জানুয়ারি থেকে আলাস্কা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ৪৯তম রাষ্ট্র।

আইদা আরও বলল, "অনেক কাল থেকেই ইউরোপিয়ানদের আলাস্কার ওপর নজর, কেন বলো তো? সোনা! এই সোনার খোঁজেই ইউরোপের হাজার হাজার মানুষ আলাস্কা টুঁড়ে বেরিয়েছে। প্রচুর সোনার খনি পাওয়াও গেছে। আধুনিক আলাস্কার জাতীয় খনিজ কী জানো? সোনা! জাতীয় জেম হল জেড পাথর। আর জাতীয় মৎস্য— তোমার প্রিয় আলাস্কা কিং স্যামন।" কথাটা শেষ করল হাসি মিশিয়ে।

কথায় কথায় চারপাশ সম্পর্কে খেয়াল ছিল না, হঠাৎ সামনের বেরি ঝোপে চোখ পড়তেই আমি এক লাফে উঠে দাঁড়ালাম।

আইদা আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে চকিতে পিছনে তাকিয়ে চাপাস্বরে বলল, "দৌড়িয়ো না, চেঁচিয়ো না, পালাতে চেষ্টা করো না, শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো। এ হল গ্রিজলি বেয়ার। কী করবে আর কী করবে না আগে থেকে ধারণা করা অসম্ভব। তবে চেঁচালে বা দৌড় লাগালে ও কিন্তু তোমাকে ধরে ফেলবেই।"

বিরাটাকার ভালুকের দিকে চোখ রেখেই খুব সন্তর্পণে ক্যামেরা রেডি করার চেষ্টা করতে যাচ্ছিলাম, আইদা প্রায় বাতাসের মতো ফিস ফিস করে বলল, "ক্যামেরাটা হাত থেকে ফেলে দাও। খুব আলতো ভাবে। একেবারেই নড়ো না।" বলে সে নিজেও নিঃশব্দে ব্যাগ থেকে একটা বেশ বড় মাপের উলু বের করে ধরে রইল।

কতক্ষণ স্ট্যাচু হয়ে আছি খেয়াল নেই, ভালুকটাকে প্রথম যখন দেখি, একমনে খাচ্ছিল, এখন খাওয়া থামিয়ে দিয়েছে। আমাদের দেখেছে কিনা বুঝতে পারছি না। মাত্র চল্লিশ-

পঞ্চাশ ফুট তফাতে এত বড় ভালুক পেয়েও আইদার কথায় আমি ক্যামেরা ফেলে দাঁড়িয়ে আছি, এ কি এতই ভয়ংকর?

ভাগ্যিস ছবি তোলার বাহাদুরি করতে যাইনি। ভালুকটা হঠাৎই ডাইনে ঘুরে হুড়মুড়িয়ে ঝোপের মধ্যে হারিয়ে গেল। আর তার কয়েক মুহূর্ত পরেই ঝোপের মধ্যে থেকে মানুষের গলায় ভীষণ আর্তনাদ শুনতে পেলাম। বোধহয় দশ-বারো মিনিটের মধ্যেই চিৎকার আর্তনাদ থেমে গেল। সব চুপচাপ। ভালুকটাকে আবারও দেখা যায় কি না তার অপেক্ষায় রইলাম। ক্যামেরাটাও প্রথম সুযোগে তুলে নিয়েছি।

কাছেই প্রায় খরগোশের মতো আকারের মেঠো কাঠবেড়ালি দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ডাইনে বাঁয়ে মাথা ঘুরিয়ে পরিস্থিতি বোঝবার চেষ্টা করছে। আমরা কিছু বোঝবার আগেই একটা সোনালি ঈগল ঝপ করে নেমে এসে ছোঁ মেরে কাঠবিড়ালিটাকে নিয়ে সোজা আকাশে উঠে গেল।

আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে মানুষের আর্তনাদ যেদিক থেকে এসেছিল আমরা সেইদিকে সাবধানে এগিয়ে চললাম। একটু করে এগোচ্ছি, তারপর থেমে সামনে ডাইনে বাঁয়ে নজর করে আবার এগোচ্ছি। একবার এরকম সব দিক দেখে বাঁয়ে ঘুরতেই যা চোখে পড়ল তাতে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। উপুড় হয়ে একটা লোক শুয়ে আছে, তার পিঠটা একেবারে ফালা-ফালা করে কাটা, সারা শরীর রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

আইদা সাবধানে চারদিক দেখে নিয়ে আরও এগিয়ে লোকটার ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, “এ সেই ভালুকের কাজ। কিন্তু লোকটা এখানে করছিল কী?” লোকটার মুখটা একপাশে ফেরানো। তা সত্ত্বেও আমি চিনতে পারলাম, সেই পাগলটা। নিচু হয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম, দেহে প্রাণ নেই।

নিজেদের জায়গায় ফিরে এসে খাবার জড়ানোর ছেঁড়া কাগজ ঘাস থেকে তুলে ব্যাগে পুরতে পুরতে আইদা বলল, “মানুষের ওপর ভালুকের এরকম সাংঘাতিক আক্রমণ খুব ছোটবেলায় একবার দেখেছিলাম, আমাদের বাড়ির কাছেই জঙ্গলে। সে ছিল একটা মাতাল, ভালুকটাকে নাকি ভালোবাসতে গিয়েছিল। কিন্তু এ লোকটা এমন নির্জন জায়গায় একা একা কী করছিল কে জানে! তুমি ছবি তুলবে না?”



আমি জানি— হতভাগ্য মানুষটি দূর থেকে লুকিয়ে তার হারানো ছেলেকে দেখছিল। অ্যাঙ্কারেজ স্টেশনে তাহলে ঠিকই দেখেছি, ও আমার পিছু নিয়েছিল।

বিনা দোষে বিনা কারণে বিদেশে এসে এমন একটা মর্মান্তিক ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে যাব — দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি কখনও। ক্যামেরা ব্যাগে রাখতে রাখতে বললাম, "না চলো, এবার আমরা ফিরে যাই।"

"চলো, পথে কোনও রেঞ্জারের দেখা পেলে ভালুকের আক্রমণে মৃত্যুর খবরটা দিয়ে যাব। জানো তো, গ্রিজলি বেয়ার উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে বড় সর্বভুক প্রাণী।"

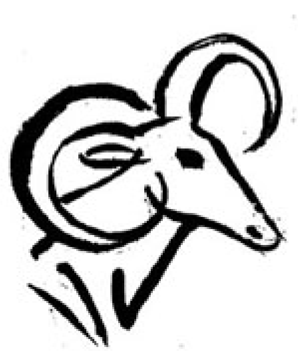
যখন বাড়ি পৌঁছলাম, তখন রাত এগারোটা। রোদ্দুর খটখট করছে।

শেষ রাতে হঠাৎই প্রচণ্ড কাঁপুনিতে ঘুম ভেঙে গেল। অনেক বছর আগে একবার রাইগার হয়েছিল, অনেকটা সেইরকম।

পাশের ঘর থেকে বুঝতে পেরে আইদা আর তার মা এসে বেশ কয়েকটা লেপ কম্বল চাপা দিয়ে আমার কাঁপুনি থামাল। এই কাঁপুনি আলাস্কার শীতে, না ভালুকের থাবায় লোকটার মৃত্যুতে জানি না।

পরদিন সকালে আমাকে ব্যাগ-বাক্স গোছাতে দেখে আইদা অবাক হয়ে বলল, "এ কী! এখনই বেরোচ্ছ নাকি?"

"ফেয়ারব্যাঙ্কস যাব।"



আইদা এবার কাছে এসে আমার চোখে চোখ রেখে বলল, "ফেয়ারব্যাঙ্কস থেকে কবে দেশে ফিরবে?"

"এখনও কিছু ভাবিনি। আলাস্কায় আরও ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করে। এখানকার বিরাট বিচিত্র প্রকৃতিই বলো, আর মানুষের বড় হৃদয়ই বলো, এই ক'দিনে কতটুকুই বা দেখেছি!

যদি সুযোগ পাই সুমেরু বৃত্ত পার হয়ে আলাস্কার আরও উত্তরে যাবার চেষ্টা করব ।”

“আলাস্কার শীতঋতু সম্পর্কে তোমার ধারণা নেই । জুলাই এখনও শেষ হয়নি, তাতেই তুমি কেঁপে সারা । সেপ্টেম্বরে ডেনালিতে বরফ পড়া শুরু হবে । ফেয়ারব্যাঙ্কস যাচ্ছ, নভেম্বর ডিসেম্বরে সারা ফেয়ারব্যাঙ্কস বরফে ঢেকে যায় । মাইনাস ৩০ ডিগ্রি থেকে মাইনাস ১০ ডিগ্রি ফারেনহাইট ঠান্ডায় পনেরো-কুড়ি ফুট বরফের মধ্যে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অতিথি, তুমি কী করবে?



আমাকে বোধহয় শেষবারের মতো সতর্ক করে দিতে আইদা বলল, ''শীতকালে এই রেলপথের বরফ কেটে লাইন পরিষ্কার করে তবে ট্রেন চালাতে হয় । রেললাইনের দুপাশে সেই কেটে রাখা বরফের ২০-২৫ ফুট উঁচু দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে যখন ট্রেন যায় মনে হয় যেন বরফের সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি । সপ্তাহে তখন একদিন মাত্র ট্রেন চলে ।''

চুপ করে শুনলাম ।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল সানফ্রান্সিসকো থেকে অ্যাঙ্কারেজের প্লেনে 'ডেইলি ফেয়ারব্যাঙ্কস' পত্রিকার একজন রিপোর্টারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, আমি ফেয়ারব্যাঙ্কস যাব শুনে সে আমাকে তার অফিসের ফোন ও ফ্যাক্স নম্বর লিখে দিয়েছিল । ট্রেনে ওঠবার আগে নম্বর দুটো আইদাকে লিখে দিয়ে বললাম, ''হয়তো এর কাছেই থাকব কয়েকদিন । যোগাযোগ রেখো । পারলে আলাস্কার আদিবাসী আর আদিম প্রকৃতি সম্পর্কে আরও জানিও ।''

৩

ফেয়ারব্যাঙ্কসের ট্রেন ধরব ডেনালি স্টেশন থেকে । বেরবার সময় আইদা একটা চিঠি আমার হাতে দিয়ে বলল, ''শেষপর্যন্ত উত্তরমেরু যদি যাওই, আমার দাদুর গ্রামে গিয়ে তাকে এই চিঠিটা দেখাবে । তোমার কথা আমি লিখে দিয়েছি । চিঠির উল্টোপিঠে আমার কাঁচা হাতে আঁকা ম্যাপ থেকে আমার দাদুর গ্রাম তুমি চিনতে পারবে না?''

আইদা আর তার মা আমার সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত এলেন । আইদার মা আমাকে সুন্দর প্যাকেট করে স্যামনের পেস্ট সঙ্গে দিয়েছেন অনেকটা ।

ট্রেন ছাড়ার সময় দুজনে হাত নেড়ে আমাকে বিদায় জানালেন ।

ডেনালি থেকে ফেয়ারব্যাঙ্কস রেলপথের সৌন্দর্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না । ক্যামেরায় যতটুকু সম্ভব তুলে নিলাম ।

একেবারে কাছেই তুষারাবৃত দীর্ঘ পর্বতশৃঙ্গ, নিচে গভীর ক্যানিয়ন, পাহাড়ি নদীতে স্থানীয় ছেলেমেয়েরা র্যাফটিং করছে । ডানদিকে মোড় নিয়ে আড়াআড়ি একটা ব্রিজে উঠে ট্রেনটা যখন নদী পেরিয়ে যাচ্ছে সে এক অসাধারণ দৃশ্য ।

ফেয়ারব্যাঙ্কস অ্যাঙ্কারেজের পরই আলাস্কার সবচেয়ে বড় শহর । এক সময়ে আলাস্কার রাজধানীও ছিল । ভারি সুন্দর শহর । একদিন ছোট টয়ট্রেনে চড়ে গেলাম 'এল ডোরাডো' গোল্ড মাইন দেখতে । সেখানে মাটি-পাথর ছেঁকে সোনা বের করার ছবি নিলাম ।

এখানকার চিনা আর টানানা নদীতে নৌকোয়, স্টিমবোটে ঘুরে ছবি তুললাম । দুই তীরের গাছপালা । ঘরবাড়ি । মানুষজন । বল্গা হরিণের দল । বাড়ির উঠোনে মুশ গামলায়

মুখ ডুবিয়ে খাচ্ছে। একটা মেয়ে হাস্কি কুকুরবাহিনীকে জোরে গাড়ি টানার ট্রেনিং দিচ্ছে।

যত দেখছি ততই বুঝতে পারছি, আলাস্কার সামান্যই আমার দেখা হয়েছে। প্রায় দু-সপ্তাহ ধরে যেখানে যতটুকু ছবি তুলেছি তাতে এই বিশাল আশ্চর্য আলাস্কার কী রূপ ধরা পড়বে, দর্শকদের প্রাণে আলাস্কার কী কথা পৌঁছে দেব? এ ছবি করা আমার পক্ষে অসম্ভব। মনে মনে ঠিক করে ফেললাম কলকাতায় কালই ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখে দেব—এই তথ্যচিত্র আমি করব না।

ঠিক করলাম ফেয়ারব্যাঙ্কস থেকে আরও উত্তরে যাব। দুচোখ ভরে দেখব আলাস্কার আশ্চর্য রূপ। ফেয়ারব্যাঙ্কসে বসে থাকলে হবে না।

এ শহর ছেড়ে যাবার আগে আমার প্লেনের বন্ধু 'ডেইলি ফেয়ারব্যাঙ্কস'-এর ডেভ মনসনের সঙ্গে একদিন দেখা করতে গেলাম। ডেভ আমাকে আশাই করেনি। চিনতেও বোধহয় দুয়েক মুহূর্ত সময় নিল, তারপরই প্রবলভাবে আলিঙ্গন করে আনন্দে আমার পিঠ চাপড়াতে লাগল। তার টেবিলের মুখোমুখি বসে তার কাজের ফাঁকে ফাঁকেই খানিকক্ষণ আড্ডা হল। এক ফাঁকে নিজেই উঠে গিয়ে দু-কাপ কফি আর একটা ফ্যাক্স আমার সামনে রেখে বলল, "তোমার দেশের ফ্যাক্স। টালকিটনার একটা মোটেলে এসেছে। সেটা আবার আমার অফিসের নম্বরে পাঠিয়েছে ডেনালি থেকে আইদা নামে একটি মেয়ে। চেনো নাকি?"

হাতে নিয়ে দেখি, চন্দননগরের 'অভিযাত্রীদল' তাঁদের এবছরের পুরস্কারের জন্য আমাকে মনোনীত করেছে আমার গত বছরের 'আমাজন' তথ্যচিত্রের জন্য। দুবছর পর পর এঁরা অভিযানমূলক তথ্যচিত্রের জন্য পুরস্কার দেন। সভ্যদের চাঁদা আর নানা জনের কাছ থেকে দান নিয়ে এঁরা পুরস্কারের অর্থ সংগ্রহ করেন। যেবার যত টাকা ওঠে সেবার তত টাকাই পুরস্কারের অর্থমূল্য। এবছর উঠেছে ১,৫৯,০০০ টাকা। আমার কলকাতার ঠিকানায় লেখা এই চিঠি আমার বন্ধু বিশ্বজিৎ টালকিটনায় ফ্যাক্স করে দিয়েছে। তারপর মাসির কাছ থেকে পেয়ে আইদা পাঠিয়েছে এখানে।



দু-তিন বার চিঠিটা পড়ে আমার মন থেকে একটা ভার নেমে গেল। 'এই টাকা থেকে আমার হয়ে আকাশচিত্র টিভি চ্যানেলকে ১,৪৮,০০০ টাকা দিয়ে আমাকে বাধিত করবেন।' চিঠির নিচে একথা লিখে সই করে বিশ্বজিতের নম্বরে ফ্যাক্সটা ফেরত পাঠিয়ে দিলাম।

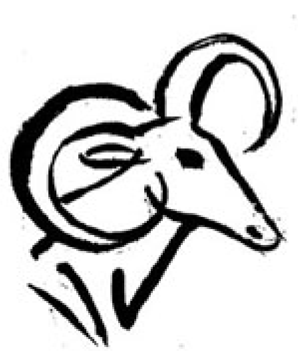
আর কোনও পিছুটান নেই। ছবি করার দায় থেকেও মুক্ত।

ডেভ বলল, তোমার দেশে ফেরার তাড়া না থাকলে আমার অ্যাপার্টমেন্টে কিছুদিন থেকে যেতে পারো।

সেখানে দিন কয়েক থেকে সুযোগমতো ফেয়ারব্যাঙ্কস থেকে একদিন সকালে বেরিয়ে ২৬০ মাইল রাস্তা হিচ হাইক করে সুমেরু বৃত্ত পার হয়ে প্রথমেই যে গ্রামে পৌঁছলাম তার নাম 'ঠান্ডা পা'। এই সেই ছোটবেলায় ম্যাপে দেখা সুমেরু বৃত্ত যেখানে জুন মাসের ২০ বা ২১ তারিখে সূর্য একবারের জন্যও অস্ত যায় না আর ২১ বা ২২ ডিসেম্বর সূর্য ওঠেই না। আমার পথের সঙ্গী গাড়ির চালক আমাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে বললেন, "টেক কেয়ার অফ ইওর ফিট, গ্রামের নামটা জানো তো, কোল্ডফুট!"

তিনি আমার পায়ের জুতোর দিকে ইঙ্গিত করলেন। সাধারণ স্নিকার। স্নো বুট নয়।

নতুন জায়গা, এপাশ-ওপাশ দেখতে দেখতে এগোচ্ছি, কয়েকটা বাড়ির উঠোনে দেখলাম অনেকগুলো হাস্কি কুকুর। কেউ গোল হয়ে উঠোনে ঘুরছে, কেউ উঠোনময় দৌড়াচ্ছে, কেউ বাঁধন ছিঁড়ে ছোটবার চেষ্টা করছে।



সস্তার হোটেলের খোঁজ করতে করতে পথের ধারে কয়েক জায়গায় চোখে পড়ল সারি সারি ফায়ারউইড গাছ ডগা অব্দি ফুলে ফুলে রঙিন হয়ে উঠেছে। তার মানে সামনেই বরফ পড়ার দিন। শুরু হবে শীতকাল। শীতে আলাস্কার সত্যিকার রূপ দেখবার জন্য মন আমার হঠাৎই ব্যাকুল হয়ে উঠল। শুনেছি ভয়ানক নিষ্ঠুর শীতকালেই আলাস্কার প্রকৃতি সবচেয়ে সুন্দর হয়ে ওঠে, আলাস্কার মানুষ হয়ে ওঠে সবচেয়ে সহৃদয়।

আমি সেই আলাস্কা দেখব ।

তার আগে খুব সস্তায় থাকার জায়গা আর এখানকার খরচ চালাবার মতো একটা কাজ খুঁজে বার করতে হবে । জমাট বরফের সূর্যহীন দিনের উপযুক্ত পোশাকও যোগাড় করতে হবে । তবে শীতকালের ভয়ানক ঠান্ডার মধ্যে এখানকার মানুষের হৃদয়ের উত্তাপ সবচেয়ে বড় ভরসা ।



কোল্ডফুটের আরও উত্তরে, আরও অনেক উত্তরে যদি যেতে পারি! যেখানে আইদার দাদুর গ্রাম। ডেনালি থেকে চলে আসার দিন কী ভাগ্যিস আইদা তার দাদুকে লেখা চিঠিটা আমার জ্যাকেটের পকেটে দিয়ে দিয়েছিল!

হঠাৎ ডেনালির সেই পাগলের মুখটা মনে পড়ল। এমনও তো হতে পারে, লোকটা যেমন বিশ্বাস করত তার সেই গৃহত্যাগী ছেলে সত্যিই আজও বেঁচে আছে। হয়তো এই বনে-পাহাড়ে সে এখনও আলাস্কার প্রকৃতি আর পশুপাখির ছবি এঁকে বেড়াচ্ছে! অ্যাঙ্কারেজের হাটে এক বৃদ্ধা যার সম্পর্কে বলেছিলেন— আলাস্কার আসল সোনা! যদি হঠাৎ-ই তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়!





এপারে শ্রীরামপুর, ওপারে বারাকপুর, মধ্যিখানে

বয়ে চলেছে গঙ্গা। যখন শ্রীরামপুরও হয়নি, বারাকপুরও হয়নি, এই গঙ্গা কিন্তু তখনও ছিল। রামায়ণ-মহাভারতের যুগেও ছিল। তবে এখন যে ঘাটে ইলিশের নৌকো আসার অপেক্ষায় আমি দাদুর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি, গঙ্গার সেই ঘাট কিন্তু তখন ছিল না। গঙ্গার ধারের রাস্তাও হয়েছে অনেক পরে। তখনও গঙ্গার পাড়ে এমন ঘরবাড়ি দোকানবাজার ছিল না। এখনকার মতো বাস, লরি, সুমো, মারুতি, রিকশা, সাইকেল, গিজগিজে মানুষের ভিড় তখন কেউ কল্পনাও করতে পারত না। জেলেদের কাছ থেকে টাটকা ইলিশ কিনতে এখন অনেকেই আগে থেকে গঙ্গার ঘাটে এসেও ভিড় করে। মাঝনদী থেকে ইলিশ ধরে নৌকো ঘাটে ভেড়া মাত্রই শুরু হয়ে যায় হুড়োহুড়ি। সকলেই চায় সবচেয়ে ভালো ইলিশটা সে-ই নেবে।

ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। ইলিশের নৌকো দেখে দাদু আমার হাতে ছাতাটা ধরিয়ে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলেন। জলের ওপর নৌকোয় প্রায় ঝুঁকে পড়ে মনের মতো ইলিশ পছন্দ করতেই তিনি ব্যস্ত।

আমি গঙ্গার ওপারে বারাকপুরের মানুষজন দেখছি। এত দূর থেকে বড়দেরও খুব ছোট্ট দেখায়। সবাইকেই মনে হয় ছোট। খুব ছোটবেলায় আমি দাদুর মুখে গালিভারের গল্প শুনে ভাবতাম বারাকপুরই নিশ্চয়ই লিলিপুটদের দেশ।

দাদুর কাছেই শুনেছি, তাঁদের ছোটবেলায় শ্রীরামপুরের গঙ্গাতীরে সারি সারি বটগাছের ছায়ায় আর নয়নতারা আর সন্ধ্যামালতীর ঝোপে একেবারে রূপকথার দেশ হয়ে যেত। নদীর জল-হাসানো জোছনায় রঙিন ফুলের ঝোপে পরীও নাকি নামতে দেখেছে অনেকে।



দাদু দেখলাম নকুল-জেলের সঙ্গে ইলিশ নিয়ে কথা বলছেন। নকুল-জেলের ছেলেকে দাদু অঙ্ক শেখান, এজন্য তিনি কোনও পয়সা নেন না, নকুলও তাই দাদুকে খাতির করে, বেশ চওড়া পেট দেখে ভালো ইলিশ বেছে নিতে দেয়।

দাদু আমাকে সিঁড়ির মাথায় দাঁড় করিয়ে রেখে গিয়েছিলেন, আমি কখন যে অন্যমনস্কভাবে সিঁড়ির একেবারে নীচে নেমে এসেছি জানি না, হঠাৎ দেখলাম, নৌকোর ইলিশগুলোর মধ্যে থেকে একটা মাছ আমার চোখে চোখ রেখে অদ্ভুতভাবে চেয়ে আছে।

দেখতে দেখতে আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। কী মাছ এটা? ইলিশ তো নয়ই, এরকম মাছ আমি কখনও দেখিওনি। মুখটা হালকা নীল, পিঠের দিকটা কমলারঙের, তার নীচেই বেগুনি, পেট পেঙ্গুইনের পেটের মতো সাদা, ঠিক যেন সিল্কের। সবচেয়ে অদ্ভুত মাছটার পাখনা। মনে হয় গাঢ় সবুজ শ্যাওলার টুকরো। মাছটা আকারেও মাঝারি মাপের ইলিশের চেয়ে বেশ কিছুটা ছোট।

এবার মাছটার চোখে চোখ পড়তেই আমার বুকের মধ্যে কেউ যেন ঢাক বাজাল। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম চোখের ভাষায় মাছটা আমাকে বলছে, "আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো।"

মুখে কোনও শব্দ না করে শুধু চোখের দৃষ্টি দিয়ে কথা বলা নতুন কিছু নয়, অনেককেই এরকম কখনও কখনও বলতে হয়। শুধু মানুষই নয়, বাড়ির পোষা কুকুর, মেঘলা মাঠের একলা গোরু, এমনকী দুপুর রোদের কাঠবিড়ালিকেও আমি শুধু চোখের ভাষায় কথা বলতে দেখেছি। কোনও মাছকে এই প্রথম দেখলাম। ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্যের, দাদুর কাছে শুনেছি মাছের চোখ জামার বোতামের মতো, একেবারে অসাড়, তাতে কোনও ভাব ফোটে না।



দাদুও বোধহয় আমার চোখের দৃষ্টিতে কিছু দেখেছিলেন, সিঁড়ির এতটা নীচে নেমে আসায় বকতে গিয়েও হেসে ফেলে বললেন, "তুই-ও একটা ইলিশ পছন্দ করলি নাকি? বল, কোনটা চাস?"

দাদুর দুহাতে বড় বড় দুটো ইলিশ । ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে নিজেও ভিজছেন, ইলিশদুটোকেও ভেজাচ্ছেন ।

আমি আঙুল দিয়ে ওই অদ্ভুত মাছটাকে দেখিয়ে দিলাম ।

"এ তো রঙিন মাছ । সাগর থেকে ভেসে এসেছে । পুষবি না কি?" বলে দাদু নকুলকেও মাছটা দেখালেন ।

নকুল মাছটা তুলে ধরতেই মাছটা ধড়ফড় করতে লাগল ।

দাদু দশ টাকার একটা নোট বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "তোর একটা মাটির হাঁড়িতে জলের মধ্যে মাছটাকে ছেড়ে দে । হাঁড়িটা সাবধানে নিয়ো দাদু ।"

শেষ কথাটা বললেন আমাকে । তারপর ছাতার তলায় এসে উপহার দেবার আনন্দে বলে চললেন, "আজই তোমায় মাছপোষার কাচের বাক্স একটা এনে দেব । তাতে জলের মধ্যে নুড়িপাথর, ঝামা, সমুদ্রের ঝিনুক দিয়ে মাছের বাসা বানাতে হবে । মাছটাকে কী খেতে দেবে ভাবতে আরম্ভ করো ।"

বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়লে অনেক রাতে আমি কাছে এসে মাছটার চোখে চোখ রেখে দাঁড়াই । মৃদু আলোয় মাছটা এমনভাবে আমার দিকে চেয়ে আছে যে-আমি যেন ওর অনেক কথাই বুঝতে পারছি । মনে হয় ও যেন বলছে— বহুদূরের সমুদ্রে ওর দেশ । মা-বাবা, ভাই-বোন, বন্ধুবান্ধবের স্নেহ-ভালোবাসায় ভরা সে ছিল এক আনন্দের দেশ । তারপর দুঃখে দুর্দশায় যুদ্ধে হিংসায় ওর সেই সুন্দর দেশ এখন নরক । দয়ামায়াহীন, লোভ-লালসায় পাগল যত প্রাণীতে ভরে গেছে । এমন দেশে একে একে মা বাবা ভাই বোন বন্ধুবান্ধব সবাই কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে মারা যাবার পর এই তিন বছরে কত সাগর-উপসাগর নদ-নদী পার হয়ে নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে এখানকার জেলের জালে ধরা পড়েছে ।

দূরে থানায় রাতের ঘণ্টা শুনে আমার মনোযোগ ভেঙে যায় । ঘণ্টার রেশ মিলিয়ে যাবার পর মাছটা আবার তার গল্প শুরু করে—

"তিন বছর ধরে কত মানুষের চোখে একটু স্নেহ, একটু ভালোবাসা, একটু মায়া, একটু মমতা খুঁজলাম । দুচোখ ভরা শুধু লোভ আর নিষ্ঠুরতা । তার মধ্যে তোমার চোখে চোখ পড়তেই মন আশায় আনন্দে ভরে গেল । এখানে আমি মনের মতো আশ্রয় পাবই ।"

আমি বললাম, ‘‘তুমি তোমার দেশের এখনকার যে অবস্থার কথা বললে আমাদের এই শ্রীরামপুরও এখন তাই । শ্রীরামপুর, রিষড়া, কোন্নগর, চন্দননগর, বালি, ভদ্রেশ্বর— সব এখন তোমার দেশের মতোই নরক । দয়ামায়াহীন, লোভী, নিষ্ঠুর লোকেরাই এখন এসব জায়গায় রাজত্ব করে । অনেক পুলিশও তাদের সাহায্য করে । দুষ্টু লোকেরা যত অন্যায়ই করুক পুলিশ তাদের ধরে না । ধরলেও তাদের কাছ থেকে টাকা পেয়ে ছেড়ে দেয় । তুমি এত সাগর-উপসাগর নদ-নদী পার হয়ে এত দেশ ঘুরে এখানে এসেছ, এখানে তুমি বাঁচবে কী করে? এখানকার মানুষ তোমার মতোই দুঃখী । বড়দের কষ্ট যন্ত্রণা দেখে আমরা ছোটরাও কষ্টে কেঁদে ফেলি । ভয়ে চুপসে যাই ।’’



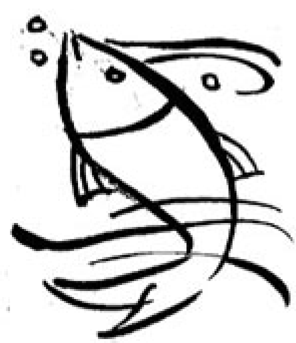
এত জোরে খটাস করে বারান্দার লাইট জ্বলে উঠল যে আমি ভয়ানক চমকে উঠলাম। আমার কি তন্দ্রা এসে গিয়েছিল? দাদু সুইচে হাত রেখেই হাঁক পাড়লেন, ‘‘এখনও জেগে বসে আছিস! নিজে ঘুমোলি না, মাছটাকেও ঘুমোতে দিলি না।’’

মাছ আমার চোখে চোখ রেখে জলের মধ্যে পাখনা স্থির করে ভেসে আছে। মাছ কি কখনও ঘুমোয়?

দাদু আবার ঘুমিয়ে পড়লে আমি পা টিপে টিপে মাছটার কাছে ফিরে এলাম। তার চোখ বোধহয় আমাকেই খুঁজছিল, বলল, ‘‘বদ্ধজলে বড় কষ্ট।’’

ভোরের আলো একটুখানি ফুটতেই আমি মাছটাকে তার কাচের বাসা থেকে বের করে নকুল-জেলের মাটির হাঁড়িতে করে সোজা বৈদ্যবাটি নিয়ে গিয়ে আমার ছোট্মাসির বাড়ির পুকুরে ছেড়ে দিলাম।

মাছটা জলে নেমেও সাঁতার কাটল না। একই জায়গায় ভেসে রইল। আমার চোখে চোখ রেখে বলল, ‘‘আমি মরে গেলে তুমি এই পুকুরপাড়ের মাটিতে আমাকে পুঁতে দিও। আমি গাছ হয়ে বেঁচে উঠব। সেই গাছে ঠিক আমারই রঙের ফুল ফুটবে। আমার গায়ের মতো কমলা, তার নীচে বেগুনি, তারপর সাদা আর সবুজ রঙের সেই ফুলের গন্ধ হাওয়ায় ভেসে যতদূর ছড়িয়ে যাবে ততদূর পর্যন্ত কেউ কাউকে আর হিংসা ঘৃণা ভয় করবে না। সবাই সবাইকে ভালোবাসবে।’’



‘‘কীরে, এত বেলা অব্দি ঘুমোচ্ছিস, শরীর খারাপ হয়নি তো? মাছটাও তো দেখছি মরে গেছে।’’ —দাদুর কথায় আমার ঘুম ভেঙে গেল। বৈদ্যবাটি তবে স্বপ্নে দেখলাম!

দৌড়ে মাছের বাসার সামনে এসে দেখি মাছটা চিৎ হয়ে ভেসে আছে। সাদা সিল্কের মতো তার বুকে-পেটে কোনও স্পন্দন নেই।

চোখের জল মুছে আমি দাদুকে বললাম, ‘‘আমি ছোট মাসির বাড়ি যাব ।’’

‘‘কেন রে, হঠাৎ?’’

‘‘এই মাছটাকে ছোট্মাসির বাড়ির পুকুরপাড়ে কবর দেব ।’’

দাদু কপাল কুঁচকে বললেন, ‘‘মাছ আবার কেউ কবর দেয়? কী ব্যাপার রে?’’

আমি সেকথার উত্তর না দিয়ে বললাম, ‘‘আমি বৈদ্যবাটি যাব ।’’

আমি জানি, দাদু আমাকে ‘না’ বলতে পারবেন না । আমার বাবা কারগিল যুদ্ধে গিয়ে আর ফিরে আসেনি বলে দাদু আমার কোনও কাজেই ‘না’ বলেন না ।





আহ্লাদী সকলের সব কথা বুঝতে পারে, কিন্তু নিজে কোনও কথা বলে না।

আমি যখন ওকে কিছু বলি, ওর চোখ দেখেই বুঝি ও আমার প্রত্যেকটা কথা মন দিয়ে শুনছে। কোন কথাটা ওর পছন্দ, কোনটা ওর মোটেই ভালো লাগছে না তাও ওর চোখের দিকে তাকিয়েই বোঝা যায়।

প্রতি বছর শীতকালে আমি হিমালয়ে যাই, সেখানে নানা ধরনের সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমার দেখা হয়। সাধুদের সঙ্গে কথা বলতে আমার ভালো লাগে। তবে যিনি যত বড় সাধু তিনি তত কম কথা বলেন। গত বছর এক সাধুর দেখা পেয়েছিলাম, তিনি কথাই বলেন না। কেউ তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালে কিংবা বসে থাকলে অনেকক্ষণ পরে তিনি শুধু বন্ধ চোখ খুলে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকবেন। আকাশের তারা যেমন আমাদের দিকে চেয়ে থাকে।

প্রতি বছর হিমালয়ে যাবার দু-তিন দিন আগে থেকে আহ্লাদী আমার কাছ ছাড়া হতে চায় না। ভালো করে খায় না, ঠিকমতো ঘুমোয় না। যতক্ষণ আমাকে পায় আমার গা ঘেঁসে বসে থাকে। রাতেও আমার পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে আমারই বালিশে মাথা রেখে চুপ করে শুয়ে থাকে।

ওর গায়ে-মাথায় অনেকক্ষণ হাত বুলিয়ে আমাকে বার বার বলতে হয় "এবার ঘুমো, দেখিস এবার খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসব।"

আহ্লাদী আমাদের মুখের কথা কত গভীরভাবে বুঝতে পারে একদিন তার একটা খুব বড় প্রমাণ পাওয়া গেল। মাথা-ভরা ঘন কাশবনের মতো চুল কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় একদিন সন্ধেবেলা আমার নিমন্ত্রণে আমাদের বাড়ি এসেছেন, সকলেই তাঁর কাছে তাঁর কবিতা শুনতে চাইছে। শেষ পর্যন্ত তিনি আমার বইয়ের তাক থেকে তাঁরই লেখা একটা বই নিয়ে সবে পড়তে শুরু করেছেন—



ও মেঘ

ও হাওয়া

ও রোদ

ও ছায়া

যাচ্ছি

অমনি 'যাচ্ছি' শুনেই আহ্লাদী জোরে চ্যাঁচাতে লাগল । প্রথমটা আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেও পরের মুহূর্তেই ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম । আসলে যারা আমাদের বাড়িতে এলে আমাদের ভালো লাগে, তাদের চলে যাওয়াটা আহ্লাদীর ভালো লাগে না । যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেই আহ্লাদী চেঁচিয়ে-মেচিয়ে একশা করে ছাড়ে । 'যাচ্ছি' মানুষ কখন বলে? যাবার সময়ই না!

আহ্লাদীর চেঁচামেচি শুনে সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিতা পড়া থামিয়ে ওকে কাছে টেনে নিয়ে, তক্ষুনি খানিকটা সুর করে বলে উঠলেন—

আয়রে আয় আহ্লাদী—

আয়রে হাসির পাল্লা দি ।

তারপর আবার পড়তে শুরু করলেন—

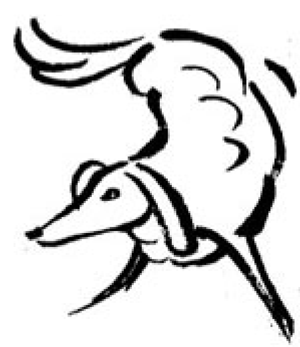
ও ফুলের সাজি

ও নদী, ও মাঝি

বনের জোনাকি

ও নীড়, ও পাখি

যাচ্ছি



সেবছরই হিমালয় থেকে ফিরে এসে শুনি, সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর মাথা-ভরা কাশফুলের মতো চুল নিয়ে সত্যিই অনেক দূরে চলে গেছেন ।

আমার এক বন্ধু আছে, নাম তার ঋষি । তার এখন চার বছরও হয়নি । এখন থেকেই তাকে রোজ স্কুলে যেতে হয় । স্কুলের ছুটির দিনে সে আমাদের বাড়ি এসে আমাকে অনেক গল্প বলে যায় । সব গল্পই কিন্তু আহ্লাদীর । ভারি মজার আর অদ্ভুত সব গল্প । আমি যদি বলি— "তুই এসব জানলি কী করে?" ঋষির উত্তর— "ও-ই তো আমাকে বলেছে ।"

"এই মিথুযক! আহ্লাদী আবার কবে কথা বলতে শিখল রে?"

মিথুযক বলেছি তো, অভিমানে মাটিতে চোখ রেখে ঋষি বলল, "আমি যখন ওর মতোই মেঝেয় উপুড় হয়ে ওর নাকের সঙ্গে প্রায় নাক লাগিয়ে ওর চোখে চোখ রেখে শুয়ে থাকি তখন চোখ দিয়েই ও ওর গল্প বলে । সেই গল্পই আমি তোমাকে বলি ।"

ঋষি আমাকে একদিন বলল, "আহ্লাদীর নিজের দেশ নাকি বরফে ঢাকা পাহাড়ের কোলে একটা গ্রামে । গ্রামের শেষে বড় সবুজ মাঠ আছে । মাঠের ধারে একটা নীল জলের হ্রদ ।" এইটুকু বলে ঋষি খানিকক্ষণ চুপ করে কী ভাবল, তারপর ফস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার বলল, "জানো তো, আহ্লাদী ওর বাবা-মার কথা কিছু মনে করতে পারে না । তাদের মুখও নাকি ভুলে গেছে । আচ্ছা —আহ্লাদী কবে আমাদের মতো কথা বলবে?"

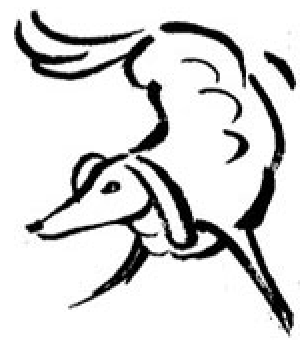
ঋষির মুখে আহ্লাদীর এইসব গল্প শুনে হাসব, না একটু একটু বিশ্বাসই করব— ভাবছি, এমন সময় ঘন ঘন বার কতক দরজাঘণ্টি বেজে উঠল । ঘণ্টি শুনেই আহ্লাদী রাগে চিৎকার করতে করতে দরজার দিকে তেড়ে গেল ।

ওকে জোর করে চেপে ধরে দরজা খুলে দিলাম । যাঁরা ঘণ্টি বাজাচ্ছিলেন, তাঁরা এবার ভয় পেয়ে আমাকেই হম্বিতম্বি করতে লাগলেন । তারপর আমি আহ্লাদীকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করে ওদের ভয় কাটিয়ে দিতে, একজন মুখে হাসি মাখিয়ে বললেন, "আমি এবার ভোটে দাঁড়িয়েছি । ভোটে জিতে আপনাদের সেবা করবার সুযোগ যেন পাই । একটু দেখবেন । আর-একটা কথা, কুকুরকে লাই দিতে নাই । ও তো আরেকটু হলে আমাদের কামড়েই দিত ।"

কথা শেষ হতে না হতেই ভোট-প্রার্থী দলের মুখের ওপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলাম । আমার এই অভদ্র ব্যবহারের কথা ভেবে পরে আমার খুবই খারাপ লেগেছে, কিন্তু কী করব— আহ্লাদীকে কেউ কুকুর বললে আমি সহ্য করতে পারি না ।

আহ্লাদীকে আমি এত ভালোবাসি কেন জানো? ও নিজেও সবাইকে শুধু ভালোবাসে ।

একদিন সন্ধেবেলা কবি শঙ্খ ঘোষ আর আমাদের প্রতিমাদি ভালোবেসে আমাদের বাড়িতে এসেছেন । রাতে খাবার টেবিলে শঙ্খ ঘোষ শোনাচ্ছিলেন তাঁর মাস্টারমশাইদের কথা, তাঁর ছাত্রদের কথা, ছেলেবেলার বন্ধুদের কথা, বড়বেলার বিখ্যাত মানুষজনের কথা, যাঁদের তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন । কারও সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক, কারও সঙ্গে শ্রদ্ধার । সকলের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ।



আমরা মুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনছিলাম । ধানখেতে ঢেউ তুলে বয়ে যাওয়া হাওয়ার মতো তাঁর ভাষা । শুনতে শুনতে খেতেও ভুলে যাচ্ছি । তার মধ্যেই হঠাৎ খেয়াল হল, আহ্লাদী কোথায়? ওকে তো অনেকক্ষণ দেখছি না । একবারও ওর ডাক শুনিনি ।

একথা শুনে শঙ্খ ঘোষ বললেন, “ও বোধহয় ঘুমোচ্ছে । আমার পায়ের পাতায় অনেকক্ষণ ধরে একভাবে ওর গলার নরম লোমের ছোঁয়া পাচ্ছি ।”

নিচু হয়ে দেখি, টেবিলের তলায় শঙ্খদার পায়ের পাতায় প্রায় মাথা রেখে আহ্লাদী শুয়ে আছে । মোটেই ঘুমোচ্ছে না, ওর দু চোখ খোলা । তার মানে মন দিয়ে শঙ্খ ঘোষের কথা শুনছে ।

রাত বারোটার সময় ওঁরা যখন চলে যাচ্ছেন তখন আহ্লাদীর চেঁচামেচি যদি তোমরা শুনতে তাহলে কেউ আর ঘুমিয়ে থাকতে পারতে না ।

আরেকদিন কী হয়েছে, বিশ্ব-দেখতে-ব্যাকুল, বাউণ্ডুলে, কবি-লেখক নবনীতা দেব সেন এসেছেন আমাদের বাড়িতে, আহ্লাদীকে দেখে যেই বলেছেন, “ও মা, কী সুন্দর রে তুই!” আহ্লাদীও অমনি দু পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে নবনীতাদির গলা-মুখ-টুক চেটে একেবারে এক কাণ্ডই করে বসেছে!

তোমরা কেউ যদি আহ্লাদীকে দেখতে চাও, তাহলে ভোরে কিংবা বিকেলে আমাদের বাড়ির ছাদে চলে এসো । ওই সময় আহ্লাদী ছাদে ঘুরে ঘুরে টবের ফুলগাছগুলোর কাছে

গিয়ে বিভোর হয়ে ফুলের গন্ধ শোঁকে । ওর ঘ্রাণশক্তি তো এমনিতেই খুব প্রবল । মাথাটা একটু উঁচু করে, অনেকক্ষণ ধরে ও ফুলের ঘ্রাণ নেয় । আমি ওই সময় ওর চোখে চোখ রেখে দেখেছি, ও তখন আমাকে দেখতে পায় না । আকাশে চোখ ভাসিয়ে মনে হয় যেন অনেক দূরের কিছু একটা দেখছে । যেন এই আকাশের ওপারের অন্য কোনও আকাশ থেকে ভেসে আসা কিছু । দেখে, না শোনে, না শোঁকে— ঠিকমতো বোঝা যায় না ।

কী দেখে, কী শোনে, কী ভাবে— জানবার উপায় নেই । এক যদি কোনওদিন মানুষের মতো কথা বলতে পারে তাহলেই ওর মুখ থেকে আমরা ওর মনের সব কথা শুনতে পাব! শুনতে শুনতে হয়তো হিংস্র আর হিংসুটে লোকের মনও টগরফুলের মতো সাদা হয়ে উঠবে, চোখের দৃষ্টি হবে জ্যোৎস্নার মতো নরম ।





কোথায় যেন এক নদীর পাড়ে বর্ধমান, না

লালগোলা, না কৃষ্ণনগরের রাজার মস্ত এক ফুলের বাগান ছিল । বহুদূর থেকে বাগানের নকশা কাটা সাদা আর গোলাপি পাথরের পাঁচিল চোখে পড়ত । এক বছর ভয়াবহ বন্যায় সেই বাগান ধুয়ে মুছে সাফ । সে রাজাও নেই, সে পাথরের পাঁচিলও নেই, কিন্তু আজও বর্ষার পরেই সেই নদীর পাড় গাছের নতুন চারায় ভরে যায় । সবই ফুলগাছের চারা । আর তারপরই দেখা দেয় হাজার রকম ফুল ।

আমাদের দুই মেয়ে গেছে সেই নদীর পাড়ে ফুল দেখতে । যাবার সময় আমি বলেছিলাম, ‘ফুল দেখতে যাচ্ছো, তো স্কুলের কী হবে?’

‘তুমি জানো না এখন ছুটি?’

‘পরীক্ষার কী হবে? ছুটির পরই তো পরীক্ষা ।’

‘সে তোমাকে ভাবতে হবে না । ফুলেরা কি কেউ স্কুলে যায়, না পরীক্ষা দেয়? তাই বলে কি তাদের রং ধুয়ে যায়, না গন্ধ উবে যায়? তারা কি সব ফেল, বাবা?’

সত্যিই তো, এর কী উত্তর! অতএব তারা নাচতে নাচতে নদীর দিকে চলে গেল ।

এদিকে আমাদের আলাস্কা যাবার সময় হয়ে আসছে । সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বত্তৃ�তা দেবার নেমন্তন্ন । তারপর আলাস্কার উত্তর থেকে দক্ষিণ ঘুরে বেড়াবার কথাও পাকা হয়ে আছে ।

দুই মেয়ে এখনও ফিরল না । আর দেরি করা যায় না । এরপর তো সেখানে শীতকাল এসে যাবে । পুরো আলাস্কা বরফে ঢেকে যাবে । আর টানা ৬৪ দিন ধরে একবারও সূর্য উঠবে না, শুধুই রাত ।



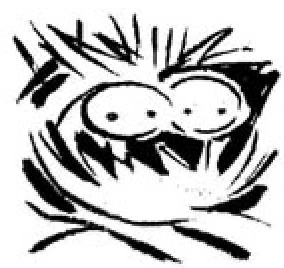
বারান্দার টবের গাছগুলো নিচের উঠোনে বের করে দিয়ে, বাড়ির দরজায় তালা লাগিয়ে দারোয়ানের কাছে চাবি রেখে আমরা আলাস্কার ফেয়ারব্যাঙ্কে গিয়ে নামলাম ।

প্রায় এক মাস ধরে আলাস্কার বরফে ঢাকা পাহাড়, বিরাট বিরাট বন, বনের পশুপাখি, এস্কিমোদের ঘরবাড়ি, বল্গা হরিণ, স্লেজগাড়ি টানার হাস্কি কুকুর, সোনার খনি— এসব দেখে যখন বাড়ি ফিরে এলাম, মেয়েরা তখনও ফেরেনি । কিন্তু বারান্দার টব ঝোলানোর দড়ির শিকেয় খড়কুটো দিয়ে চমৎকার বাসা বানিয়ে একজোড়া বুলবুলি একটা ডিম পেড়ে তার কাছাকাছি ওড়াউড়ি করছে ।

পরদিন দেখি আরও একটা ডিম পেড়েছে । এর দুদিন পর ভোরবেলা চুপিচুপি দেখতে গেছি ডিম ফুটে বাচ্চা হয়েছে কি না, টুলের ওপর এক পা তুলে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়িয়ে ছোট্ট বাসার মধ্যে উঁকি দিয়ে আমি অবাক— এ যে একেবারে ম্যাজিক! দুটো ডিমের জায়গায় তিনটে ডিম! তার মানে কী, মা বুলবুলি চারদিন ধরে তিনটে ডিম পেড়েছে!

বুলবুলির ডিমপাড়ার নিয়ম জানি না, হয়তো এভাবেই দুয়েক দিন পর পর ডিম পাড়ে ।

পাছে ওদের কোনওরকম অসুবিধা হয়, তাই আমরা ওই বারান্দার দিকের জানলার কাচ ও পাশের দরজাটা খুলি না, বাড়িতে বন্ধু বা আত্মীয় কেউ এলে ওদিকের সোফায় কাউকে বসতে দিই না, নিজেরাও বসি না । কেননা, বুলবুলি পাখি মানুষের পায়ের আওয়াজ পেলেই উড়ে যায় । বন্ধুরা, আত্মীয়রা সামনে বলে, জড়ভরতের মতো মায়ায় জড়ালে! পেছনে বলে, আদিখ্যেতা! আমরা কারও কোনও কথায় কান দিই না, শুধু অপেক্ষা, কবে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরবে!



মা-পাখি আর বাবা-পাখিকে দেখেও কিছু বোঝার উপায় নেই । তারা কখনও বাসায় এসে বসে, একজন যদি বাসায়, অন্যজন বাসার কাছেই বারান্দার গ্রিলে । কখনও দুজনেই বারান্দার বাইরে কেবল টিভির লম্বা তারে বসে নিজেদের বাসার দিকে নজর

রাখে। আকাশে কাছাকাছি কাক বা চিল দেখলে ভয়ে অশান্তিতে যতটা পারে বাসার কাছ ঘেঁসে ওড়াউড়ি করে। উল্টো রথের দিন ভোরে উঠে বন্ধ জানলার কাচ দিয়ে দেখি বাসার কাছে মা বাবা কেউ নেই। তবে কি ডিম ফুটেছে? মা-বাবা গেছে বাচ্চাদের জন্য খাবার আনতে?

নিঃশব্দে দরজা খুলে, টুলের ওপর উঠে বাসায় ঝুঁকে কী দেখলাম বলো তো? একটা ডিম ফেটে তার ভেতর থেকে মরা একটা বুলবুলির ছানার পা একটুখানি বেরিয়ে আছে। আর পাশেই দুটো পাখির ছানা, তাদের পেট বুক গলা সবই পাখির, মুখটা শুধু ছোট্ট কুলের মতো গোল, তাতে নাক মুখ চোখ বসানো, অবিকল মেয়ের মুখ। এত ছোট্ট, এমন মিষ্টি যে দেখে চোখ ফেরানো যায় না।



আমি এতই অবাক হয়েছি যে দুটি পাখি-মেয়েই ভারি মিষ্টি স্বরে কী বলল শুনতে পেলাম না। জীবনে এর চেয়ে বেশি অবাক আর কিছুতেই হইনি। শুনলাম গানের মতো মিহি স্বরে একটা পাখি বলছে, এত ধোঁয়া কেন, দম নিতে পারছি না। অন্য পাখিটা বলল, বড় হয়ে উড়ব কী করে?

ঘনঘন ডোরবেল শুনে ঘুম ভেঙে গেল। এতক্ষণ তবে স্বপ্ন দেখছিলাম!

দরজা খুলে দেখি দুই মেয়ে ফিরে এসেছে। একে একে দুজনকেই হাসিমুখে জড়িয়ে ধরলাম বটে, কিন্তু ডিম ফুটে মিষ্টি মুখের ছোট্ট দুটি পাখি হবার ঘটনাটা মিথ্যে হয়ে যাওয়ায় মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল। ঘরে এসে চোখে হাত চাপা দিয়ে আরও খানিকক্ষণ ঘুমোবার চেষ্টা করছি, দুই মেয়ে একসঙ্গে লাফাতে লাফাতে ঘরে ঢুকে বলল, 'বাবা, বাবা, শিগগিরি এসো, দেখে যাও, বারান্দায় একটা পাখির বাসা। তাতে ছোট্ট ছোট্ট দুটো পাখির ছানা, পেট বুক গলা সবই পাখির, মুখটা শুধু কুঁচফলের মতো গোল, তাতে ঠোঁট নাক চোখ— একদম আমাদের দুজনের মতো!'

'কই, কোথায়, চল তো দেখি— তবে তো স্বপ্ন নয়।' বলতে বলতে তড়াক করে বিছানায় উঠে বসে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। অন্ধকার ঘর, রাত শেষ হতে এখনও অনেক বাকি।

